বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এর ম্যাপিং

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জুন ২০২২

আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
হাইড্রোকার্বন ইউনিট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি ও খনিজ খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খনিজ সম্পদ এর আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অর্থনীতি এবং আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানি। বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে দেশের সুপ্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকান্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এবং উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। ফলে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছি। পাশাপাশি দেশের খনিজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এ প্রকাশনা আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এ৪৯ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

বর্তমান সরকারের সময়কালে জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ৫

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে অদ্যাবধি সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি ৬

প্রাকৃতিক গ্যাস ৭

গ্যাস মজুদ প্রাক্কলন ৯

গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহ ১০

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার ১১

অনশোর এ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম ১১

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নে PSC এর আওতাধীন গৃহীত কার্যক্রম ১৩

প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) ১৫

ইস্টার্ন ফোল্ড বেল্টের সমস্ত সম্ভাবনা Explore/Revisit করা ১৭

গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন ১৭

Unconventional Hydrocarbon Reservoir ১৯

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ২০

কয়লা ২২

পেট্রোলিয়াম সেক্টর ২৬

কনডেনসেট ২৯

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ ৩০

Peat (পিট) ৩০

Limestone (চুনাপাথর) ৩১

White Clay (চীনামাটি) ৩৪

Hardrock (কঠিন শিলা) ৩৫

Glass Sand (কাঁচবালি) ৩৬

Gravel (নুড়িপাথর) ৩৭

Heavy Mineral (Beach Sand) ভারি মণিক (সৈকত বালি) ৩৮

ইলমেনাইট ৩৮

ম্যাগনেটাইট ৪০

জিরকন ৪২

রুটাইল ৪৪

গারনেট ৪৫

কায়ানাইট ৪৯

মোনাজাইট ৫২

লিউকক্সিন ৫৩

উপসংহার ৫৫

টেবিল তালিকা

টেবিল ১: ২০০৯ হতে অদ্যাবধি সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি.....৬
টেবিল ২: দেশের সকল গ্যাসক্ষেত্রের বর্তমান চিত্র.....৯
টেবিল ৩: একনজরে গ্যাস রিজার্ভ, উৎপাদন ও অবশিষ্ট.....১০
টেবিল ৪: গ্যাসের খাতভিত্তিক চাহিদা.....১০
টেবিল ৫: এক নজরে গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন (Unrisked).....১৮
টেবিল ৬: একনজরে তেল/কনডেনসেট রিসোর্স প্রাক্কলন (Unrisked).....১৮
টেবিল ৭: এক নজরে গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন (Risked).....১৮
টেবিল ৮: একনজরে এলএনজি আমদানি চিত্র.....২০
টেবিল ৯: দেশের সকল কয়লাক্ষেত্রের অবস্থান চিত্র.....২৫
টেবিল ১০: বিগত ৫ বছরের কয়লা উৎপাদন ও আমদানি চিত্র.....২৫
টেবিল ১১: একনজরে দেশের পেট্রোলিয়াম সেক্টর.....২৭
টেবিল ১২: বিগত ৫ বছরের কনডেনসেট উৎপাদন চিত্র.....২৯
টেবিল ১৩: দেশে পিট এর অবস্থান ও মজুদ.....৩০
টেবিল ১৪: দেশে চুনাপাথর এর অবস্থান ও মজুদ.....৩১
টেবিল ১৫: দেশে চীনামাটি এর অবস্থান ও মজুদ.....৩৫
টেবিল ১৬: দেশে কঠিন শিলা এর অবস্থান ও মজুদ.....৩৫
টেবিল ১৭: দেশে ভারি মণিক সৈকত বালি এর অবস্থান ও মজুদ.....৩৮
টেবিল ১৮: গারনেট খনিজ.....৪৬
টেবিল ১৯: মোনাজাইট খনিজ গ্রুপ.....৫৩

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: ব্লকভিত্তিক পিএসসি কার্যক্রম.....১৬
চিত্র ২: মহেশখালী এল এন জি টার্মিনাল.....২০
চিত্র ৩: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি.....২২
চিত্র ৪: কয়লা খনির পাতালপথ, বড়পুকুরিয়া.....২৩
চিত্র ৫: ড্রিলিং পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ, বড়পুকুরিয়া.....২৪
চিত্র ৬: *দেশের কয়লা জোন*.....২৬
চিত্র ৭: ইলমেনাইট.....৩৯
চিত্র ৮: কালো ইলমেনাইট বালু.....৩৯
চিত্র ৯: ম্যাগনেটাইট.....৪০
চিত্র ১০: ম্যাগনেটাইট স্ফটিক.....৪১
চিত্র ১১: ম্যাগনেটাইট (লোডস্টোন).....৪১
চিত্র ১২: জিরকন.....৪২
চিত্র ১৩: জিরকন রত্নপাথর.....৪৩
চিত্র ১৪: রুটাইল.....৪৪
চিত্র ১৫: গারনেট.....৪৬
চিত্র ১৬: গারনেট রত্নপাথর.....৪৯
চিত্র ১৭: কায়ানাইট.....৫০
চিত্র ১৮: কায়ানাইট রত্নপাথর.....৫১
চিত্র ১৯: মোনাজাইট.....৫২
চিত্র ২০: বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের অবস্থান চিত্র.....৫৪

ভূমিকা

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান উৎস হচ্ছে জ্বালানি। বর্তমান সরকার জ্বালানি খাত উন্নয়নের অপরিহার্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করে জ্বালানি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে এসকল গ্যাসক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) এবং রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানি খাতে পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন গঠনমূলক ও ফলপ্রসু কর্মকান্ডের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ -এর বাস্তবায়নাধীন ১৭টি লক্ষ্যের অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে।

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণরোধসহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছে। ২০০৯ সালে যেখানে দৈনিক গ্যাসের গড় উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৭৬০ মিলিয়ন ঘনফুট।

জ্বালানি তেল দেশের পরিবহন খাত, কৃষি খাত, বিদ্যুৎ, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার জানুয়ারি ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি সারা দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্বালানি তেলের Supply Chain এ কোনরূপ সংকট/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি।

কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ফলশ্রুতিতে ২০০৮-০৯ সালে দেশে যেখানে বানিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ ছিল ১৯.৯২ Mtoe, সেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.১২ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভুক্ত নয়), প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার হয়েছে ৫৬.৯২ Mtoe (bio-fuel সহ) যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

বর্তমান সরকারের সময়কালে জ্বালানি খাতের উন্নয়ন

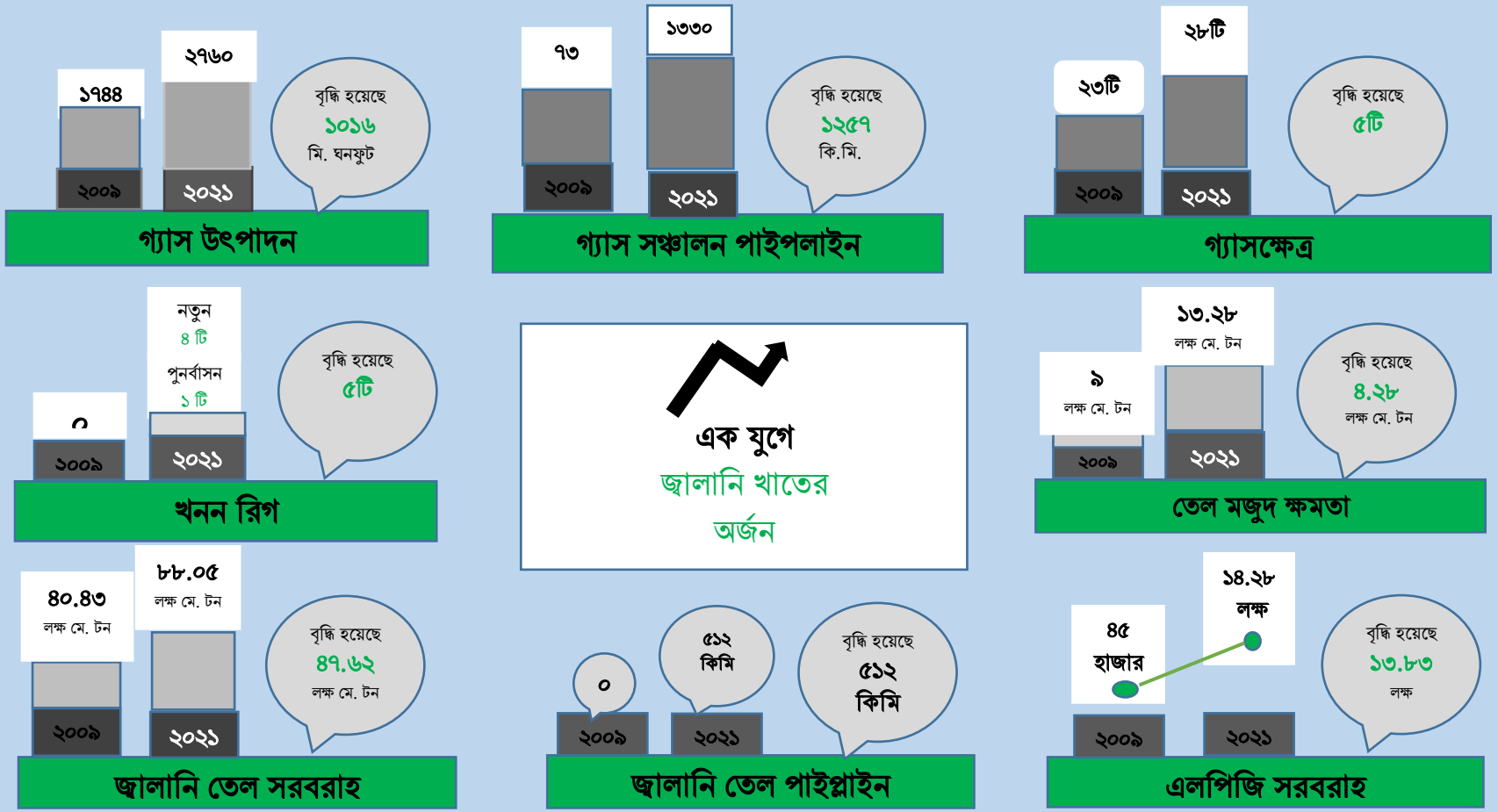

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে অদ্যাবধি সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি

টেবিল ১: ২০০৯ হতে অদ্যাবধি সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি

প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি (আরএলএনজিসহ)	১,৫৫৬ এমএমসিএফডি (২৩ জুন, ২০২১)
নতুন রিগ ক্রয়	৪টি
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৩১,৪২৮ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স- ১৩,২৯৭ ও আইওসি - ১৮,১৩১)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৫,৮৩৩ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স-৪,০৭০, এসজিএফএল-৭০৫ ও আইওসি-১,০৮৫)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	১৯,৭৭৩ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স-১,৬০২ ও আইওসি-১৮,১৭১)
নতুন স্ট্রাকচার চিহ্নিতকরণ	১৬টি (১৫টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৫টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২১টি (১৩টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৬টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৫০টি (১১টি বাপেক্স, ৪টি এসজিএফএল, ১৩টি বিজিএফসিএল ও ২২টি আইওসি)
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৫৬টি (১৩টি বাপেক্স, ৫টি এসজিএফএল, ১৯টি বিজিএফসিএল এবং ১৯টি আইওসি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	১,৩২৯.৮৪ কিলোমিটার (মার্চ, ২০২২)
গ্যাস প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	৩,৮৮,৬০০টি
কয়লা উৎপাদন	১৩০.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট পাথর উত্তোলন	৭৮.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) ভূত্বকে প্রাপ্ত দাহ্য গ্যাসের মিশ্রণ (প্রায়ই খনিজ তেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে)। কয়লা ও তেল ছাড়া বিশ্বের তিনটি জীবাশ্ম জ্বালানির অন্যতম। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বাভাবিক চাপ ও তাপে গ্যাস বা বাষ্পাকারে অবস্থিত হাইড্রোকার্বনই প্রাকৃতিক গ্যাস। এর প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মিথেন হলেও ইথেন, প্রোপেন ও অন্যান্য উপাদানও এতে বিদ্যমান থাকতে পারে। প্রচলিত অপদ্রব্যসমূহের মধ্যে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক গ্যাস স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবেও থাকতে পারে আবার তেল সহযোগেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

সচ্ছিদ্র ও প্রবেশ্য হাইড্রোকার্বনবাহী বালুময় গঠন ও অনন্য ফাঁদ তৈরির উপযোগী শিলাসোপান সম্বলিত একটি বদ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশকে সবসময় একটি প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মনে করা হয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তর সিলেট থেকে শুরু করে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই গ্যাস বলয় সম্প্রসারিত। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগেও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ বান্ধব এই জ্বালানি একদিকে যেমন নির্মল শিখায় জ্বলে তেমনি এর দহন ক্রিয়াও কটুগন্ধহীন। গৃহস্থালির রান্নাবান্নার কাজে, কলকারখানায় (ধাতুমলবিদ্যা, মৃৎশিল্প, কাচ, রুটি বিস্কুটের কারখানা, পাওয়ার স্টেশন, সিমেন্ট, স্টিম বয়লার ইত্যাদি) ও কৃষিতে (শুষ্ক ও তপ্তকরণ এবং স্টিম বয়লারের জ্বালানি হিসেবে) এর ব্যবহার ব্যাপক। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তরলীকৃতত পেট্রোলিয়াম গ্যাস, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সঙ্কুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় এবং গার্হস্থ্য, শিল্প ও কৃষিকাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রাসায়নিক শিল্পে কৃত্রিম সার, প্লাস্টিক, রজন, রবার, কার্বনব্ল্যাক, নির্মলক (detergents), অ্যামোনিয়া ও নাইট্রিক এসিডের মত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রস্তুতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

অনুসন্ধান ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আসাম রেলওয়ে এন্ড ট্রেডিং কোম্পানি এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রথম রেলপথ নির্মাণ করে। কোম্পানিটি এই ভূখন্ডে ১৮৮৩ সনে প্রথম হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান এবং এ লক্ষ্যে ড্রিলিং শুরু করে। পরবর্তীতে স্থানীয় বাজারে সরবরাহের লক্ষ্যে পেট্রোলিয়াম আমদানি ও বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত আসাম অয়েল কোম্পানি পূর্বোক্ত কোম্পানির উত্তরসূরী হিসেবে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কর্মকান্ড ১৯১১ সনে শুরু করে। বার্মা অয়েল কোম্পানির অনুসন্ধান কর্মসূচীতে সুরমা বেসিন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯০৮ থেকে ১৯১৪ সময়কালে ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি সীতাকুন্ড উর্ধ্বভাঁজে কয়েকটি অনুসন্ধান কূপ খনন করে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে ১৯১৪ সন থেকে আজ অবধি দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কূপ খনন করেছে। দেশে উপর্যুপরি অনুসন্ধান কর্মকান্ডের ফসল হিসেবে ১টি তেল ও ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুরুর দিকে (১৯১০-১৯৩৩) তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কূপ মূলত ভাঁজ অঞ্চলের তেলের ঝরণ বা নিঃসরণ এলাকায় স্থাপিত হতো। এসময়ে ৭৬৩ মিটার থেকে ১০৫০ মিটার গভীরতার অনুসন্ধান কূপ খনন করা হতো। উন্নততর প্রযুক্তি সহজলভ্য হবার সাথে সাথে গভীরতর কূপ খনন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং এতে অনুসন্ধান সাফল্যের হারও বেড়েছে। ১৯৫৫ সনে বার্মা অয়েল কোম্পানি এদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে। ষাট ও সত্তর দশকে অনেকগুলো গ্যাসক্ষেত্রের সফল আবিষ্কার নিশ্চিত হয় কূপ খননের মাধ্যমেই। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কূপ খননের কাজে প্রতি তিনটি ড্রিলিং এর একটিতে সফল হওয়া খুবই উৎসাহ ব্যাঞ্জক বলে বিবেচিত হয়। তবে ১৯১০-১৯৩৩ সনের মধ্যবর্তী সময়কালে এদেশে মোট ৬টি ড্রিলিং হলেও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাকিস্তানের শুরুর দিকে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের নতুন উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং ১৯৫১-১৯৭০ সময়কালে মোট ২২টি কূপ খনন করা হয়, যার ফলে ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৭২-১৯৯২) মোট ২৪টি কূপ খনন করে ৯টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয় ১৯৯৩-২০০০ সময়কালে মোট ১০টি কূপ খননের মাধ্যমে আরও ৫টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।

দেশে ১৯৫৯ সনে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম শিল্পখাতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। ১৯৬৮ সনে প্রখ্যাত লেখক শওকত ওসমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার বাসায় সর্বপ্রথম পাইপ যোগে রান্নার গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। শিল্পখাতে গ্যাসের প্রধান ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে। শিল্পখাতে অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্যাস ব্যবহারকারী হলো: সার কারখানা, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, পাম্প ও পেপার মিল। এই শিল্প কারখানাগুলো মূলত দেশের পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশের ২১ টি গ্যাসক্ষেত্রের প্রায় ১১৩টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। গ্যাসের দৈনিক গড় উৎপাদন প্রায় ২৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ উৎপাদন করছে প্রায় ১৪৭৮ মিলিয়ন ঘনফূট গ্যাস। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের দৈনিক চাহিদা গড়ে প্রায় ৪৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং এ চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব জ্বালানী হিসেবে গৃহস্থালি, পরিবহনব্যবস্থা, শিল্পকারখানা, সারকারখানা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে এর ব্যাপক ব্যবহারই এ চাহিদা বৃদ্ধির কারণ। যেহেতু বাংলাদেশের জ্বালানীখাত মূলত প্রাকৃতিক গ্যাসের উপরই নির্ভরশীল কাজেই গ্যাসক্ষেত্রসমূহ

থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং বিকল্প জ্বালানীর ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশকে কঠিন জ্বালানী সংকটে পড়তে হবে।

গ্যাস প্রবণ (Gas prone) বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে একটি প্রমাণিত গ্যাস প্রবণ দেশ। গ্যাস মূলত পাওয়া গিয়েছে ভূবন ও বোকাবিল স্তরসমষ্টির শিলায়। মায়োসিন কর্দম শিলা, বিশেষ করে মধ্য ও প্রবীণ ভূবন, যার ঞঙঈ ০.৯% পর্যন্ত, গ্যাস প্রবণ, এবং এটি অবশ্যই প্রান্তিক উৎস শিলার শ্রেণীভুক্ত। মায়োসিন ভূবন ও বোকাবিল স্তরসমষ্টি মাত্র ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ বছর আগে গ্যাস উৎপাদী পরিপক্কতা অর্জন করে, বিশেষ করে গভীরতর অববাহিকীয় অঞ্চল ও প্রবীণ ভূবন স্তরসমষ্টিতে। এইসব অবক্ষেপ থেকে উৎপাদিত গ্যাস প্রায় সম্পূর্ণত উত্তলভঙ্গ (anticline) দ্বারা আবদ্ধ যা ঐ সময়ের মধ্যে সুরমা বেসিনে গড়ে উঠেছিল। কিছু ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন, ভূবন স্তরসমষ্টির কর্দমশিলা উৎস শিলা হওয়ার মতো যথেষ্ট জৈব পদার্থে পূর্ণ নয়। তারা আরও বিশ্বাস করেন ভূবন স্তরসমষ্টির চাইতে প্রবীণ ওলিগোসিন বরাইল শিলাদলের কর্দমশিলা জৈব পদার্থে পূর্ণ এবং গ্যাস উৎপাদন করে। পরবর্তীতে এই গ্যাস শিলার ঊর্ধ্বমুখী ঢালের দিকে কয়েক কিলোমিটার অভিপ্রয়াণের (migration) পর পরিশেষে ভূবন এবং বোকাবিল স্তরসমষ্টির বেলেপাথর আধারে সঞ্চিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলির মধ্যে ২টি উপকূলের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এবং অবশিষ্ট গ্যাসক্ষেত্রগুলি দেশের পূর্ব ভূভাগে অবস্থিত। প্রাথমিক মূল্যায়নে (Total gas initially in place-GIIP) এই ২৮টি গ্যাসক্ষেত্রের মোট মজুত প্রায় ৪০.০৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বলে অনুমিত হয়েছে যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুত প্রায় ২৯.৯৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০২২ সালের মার্চ নাগাদ প্রায় ১৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট মজুতের পরিমাণ প্রায় ১০.৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ১,০০০ থেকে ৩,৫০০ মিটার গভীরতায় মায়োসিন (৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে) - প্লায়োসিন (২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে) সময়কালের বেলেপাথর আধারে এই প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ যার মধ্যে প্রায় ৯৫% থেকে ৯৯%-ই মিথেন এবং সালফার প্রায় অনুপস্থিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের গড় গঠন হচ্ছে মিথেন ৯৭.৩৩ ভাগ, ইথেন ১.৭২ ভাগ, প্রপেন ০.৩৫ ভাগ এবং অবশিষ্ট ০.১৯ ভাগে রয়েছে উচ্চতর হাইড্রোকার্বনসমূহ। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাসই শুষ্ক, তবে অল্প কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কনডেনসেটের উপস্থিতিসহ আর্দ্র গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। আর্দ্র গ্যাসক্ষেত্রগুলি হচ্ছে বিয়ানীবাজার (কনডেনসেট ১৬ ব্যারেল/মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস), জালালাবাদ ((কনডেনসেট ১৫ ব্যারেল/মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস) এবং কৈলাশটিলা (কনডেনসেট ১১ ব্যারেল/মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস)।

দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলি হচ্ছে সিলেট, ছাতক, তিতাস, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং, কুতুবদিয়া, বেগমগঞ্জ, কামতা, ফেনী, বিয়ানীবাজার, বাঙ্গুরা, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, সুন্দলপুর, নরসিংদী, মেঘনা, শাহবাজপুর, সালদানদী, সাংগু, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ এবং জকিগঞ্জ। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্র বাংলাদেশের পূর্বাংশের ইন্দোবার্মা ভাঁজসমূহের সন্নিকটস্থ স্থলভাগে অবস্থিত।

সাধারণত ঊর্ধ্বভঙ্গীয় ধারকে (anticlinal traps) প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত হয়। আধারের প্রবেশ্যতা, সচ্ছিদ্রতা প্রভৃতি গুণাগুণের ভিত্তিতে গ্যাসাধার উত্তম থেকে অতি উত্তম হয়ে থাকে। অনেক গ্যাসক্ষেত্রেই একাধিক বেলেপাথর গ্যাসাধার রয়েছে, এমনকি কোন কোনটিতে ১২টির মতো গ্যাস-বেলেপাথর অঞ্চল বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত গ্যাসের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূভাগের জৈব পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং অয়েল উইন্ডোতে (oil window) সঞ্চিত হয়। গ্যাসের উৎস শিলাসমূহ সাধারণত বরাইল শিলাদলের ওলিগোসিন (বর্তমান কাল থেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর পূর্বে) কর্দমশিলা হয়ে থাকে। এই গ্যাস ওলিগোসিন কর্দম উৎসশিলা থেকে চ্যুতি নালার মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী মধ্যম থেকে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে মায়োসিন বেলেপাথর আধারে সঞ্চিত হয় বলে ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা।১৯৫৫ সালে প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে ২৮ টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে,যার মধ্যে অনশোর ২৬ টি এবং অফশোর ২ টি। অনশোরে বর্তমানে ২১ টি গ্যাসফিল্ডে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ১টি অফশোর ফিল্ড ১৪ বছর উৎপাদন কার্যক্রমের পর বর্তমানে সাসপেন্ডেড এবং অপর অফশোর ফিল্ডে মজুদ কম থাকায় উৎপাদন লাভজনক হবেনা বিধায় কার্যক্রম শুরু হয়নি। উত্তোলনযোগ্য ২৯.৯৩ Tcf গ্যাসের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯.৩০ Tcf গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ১০.৬২ Tcf অবশিষ্ট আছে।দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণরোধসহ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছে।

গ্যাস মজুদ প্রাক্কলন

টেবিল ২: দেশের সকল গ্যাসক্ষেত্রের বর্তমান চিত্র

ক্রমিক.	গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদন কুপসংখ্যা	আবিষ্কারের বছর	উৎপাদন শুরু	GIIP	2P রিজার্ভ	ক্রমপুঞ্জীত গ্যাস উৎপাদন	অবশিষ্ট রিজার্ভ
১	বেগমগঞ্জ	১	১৯৭৭	২০১৫	৪৭.০	৩৩.০	৯.০	২৪.০
২	শাহবাজপুর	৪	১৯৯৫	২০০৯	৪১৫.০	২৬১.০	৮১.৯	১৭৯.১
৩	সেমুতাং	২	১৯৬৭	২০১১	৬৫৪.০	৩১৮.০	১৪.০	৩০৪.০
৪	ফেঞ্চুগঞ্জ	২	১৯৮৮	২০০৪	৪৮৩.০	৩২৯.০	১৬৭.০	১৬২.০
৫	সালদা নদী	২	১৯৯৫	২০১২	৩৯৩.০	২৭৫.০	৯৬.০	১৭৯.০
৬	শ্রীকাইল	৩	২০১২	২০১৩	২৩০.০	১৬১.০	১২১.৮	৩৯.২
৭	সুন্দলপুর	১	২০১১	২০১১	৬২.২	৫০.২	২০.৬	২৯.৬
৮	রূপগঞ্জ	০	২০১৪	২০১৭	৪৮.০	৩৩.৬	০.৭	৩২.৯
	বাপেক্স	**১৫**			**২,৩৩২.২**	**১,৪৬০.৮**	**৫১০.৯**	**৯৪৯.৯**
৯	মেঘনা*	১	১৯৯০	২০০৪	১২২.০	১০১.০	৭৮.৭	২২.৩
১০	নরসিংদী	২	১৯৯০	১৯৯০	৪০৫.০	৩৪৫.০	২৩১.২	১১৩.৮
১১	কামতা	০	১৯৮১	১৯৮২	৭২.০	৫০.০	২১.১	২৮.৯
১২	হবিগঞ্জ*	৮	১৯৬৩	১৯৬৯	৩,৯৮১.০	২,৭৮৭.০	২,৬৪২.৩	১৪৪.৭
১৩	বাখরাবাদ	৭	১৯৬৯	১৯৬৯	১,৮২৫.০	১,৩৮৭.০	৮৫৬.২	৫৩০.৮
১৪	তিতাস	২৬	১৯৬২	১৯৬৯	৯,০৩৯.০	৭,৫৮২.০	৫,১৪৬.৬	২,৪৩৫.৪
	বিজিএফসিএল	**৪৪**			**১৫,৪৪৪.০**	**১২,২৫২.০**	**৮,৯৭৬.১**	**৩,২৭৫.৯**
১৫	সাঙ্গু	০	১৯৯৬	-	৯৭৬.০	৭৭১.০	৪৮৯.৫	২৮১.৫
	সান্তোস/কেয়ার্ন	**০**			**৯৭৬.০**	**৭৭১.০**	**৪৮৯.৫**	**২৮১.৫**
১৬	বিবিয়ানা*	২৬	১৯৯৮	২০০৭	৮,৩৮৩.০	৫,৭৫৫.৪	৫,০৭৫.৮	৬৭৯.৬
১৭	মৌলভী বাজার*	৪	১৯৯৭	২০০৫	৪৯৪.০	৪২৮.০	৩৩৯.৯	৮৮.১
১৮	জালালাবাদ*	৭	১৯৮৯	১৯৯৯	২,৭১৬.০	১,৪২৯.৩	১,৫০৯.৫	০.০
	শেভরন	**৩৭**			**১১,৫৯৩.০**	**৭,৬১২.৭**	**৬,৯২৫.২**	**৬৮৭.৫**
১৯	ফেনী	০	১৯৮১	২০০৪	১৮৫.০	১৩০.০	৬৩.০	৬৭.০
	নাইকো	**০**			**১৮৫.০**	**১২৯.৬**	**৬৩.০**	**৬৬.৬**
২০	কৈলাশটিলা	৪	১৯৬২	১৯৮৩	৩,৪৬৩.০	২,৮৮০.০	৭৮১.১	২,০৯৮.৯
২১	সিলেট	০	১৯৫৫	১৯৫৮	৫৮০.০	৪০৮.০	২১৯.৪	১৮৮.৬
২২	রশিদপুর	৫	১৯৬০	২০০৫	৩,৮৮৭.০	৩,১৩৪.০	৬৮২.৫	২,৪৫১.৫
২৩	ছাতক	০	১৯৫৯	১৯৫৯	৬৭৭.০	৪৭৪.০	২৫.৮	৪৪৮.২
২৪	বিয়ানী বাজার*	২	১৯৮১	১৯৯৯	২২৫.০	১৩৭.০	১০৪.৮	৩২.২
	এসজিএফএল	**১১**			**৮,৮৩২.০**	**৭,০৩৩.০**	**১,৮১৩.৬**	**৫,২১৯.৪**
২৫	বাঙ্গুরা*	৫	২০০৪	২০০৬	৭৩০.০	৬২১.০	৫২৪.৩	৯৬.৭
	টাল্লো	**৫**			**৭৩০.০**	**৬২১.০**	**৫২৪.৩**	**৯৬.৭**
২৬	কুতুবদিয়া	০	১৯৭৭	-	৬৫.০	৪৬.০	০.০	৪৬.০
২৭	ভোলা নর্থ	-	২০১৮	-	-	-	-	-
২৮	জকিগঞ্জ	-	২০২১	-	-	-	-	-
	মোট	**১১২**			**৪০,০৯২.২**	**২৯,৯২৬.৫**	**১৯,৩০২.৭**	**১০,৬২৩.৮**

* Depletion Plan প্রয়োজন

** পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত আপডেটকৃত GIIP ইস্টিমেট

টেবিল ৩: একনজরে গ্যাস রিজার্ভ, উৎপাদন ও অবশিষ্ট

গ্যাস ইনিশিয়ালী ইন প্লেস (Proven + Probable)	৪০,০৯২.১৯	Bcf	৪০.০৯	Tcf
আহরণযোগ্য (Proven + Probable)	২৯,৯২৬.৫০	Bcf	২৯.৯৩	Tcf
গ্যাস উৎপাদন মার্চ ২০২২	৭২.১৫	Bcf	০.০৭	Tcf
ক্রমপুঞ্জীত উৎপাদন মার্চ ২০২২ পর্যন্ত	১৯,৩০২.৭০	Bcf	১৯.৩০	Tcf
অবশিষ্ট রিজার্ভ	১০,৬২৩.৮০	Bcf	১০.৬২	Tcf

গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহ

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালীতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। সময়ের সাথে একদিকে গ্যাসের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে গ্যাসের মজুদ কমে আসায় এর সরবরাহ হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে ২০৩০ সাল নাগাদ গ্যাসের খাতভিত্তিক চাহিদার একটি চিত্র দেয়া হলঃ

টেবিল ৪: গ্যাসের খাতভিত্তিক চাহিদা

Unit: MMSCFD

Year	* Power	Fertilizer	Cap. Power	Industry	Domestic	CNG	Commercial & Tea	Total Demand	Total Supply
২০১৯	১২৮৪	৩১৬	৪৮০	৭১০	৪২৫	১৩৯	৩৮	৩৩৯২	৩৩৩১
২০২০	১৩৩৪	৩১৬	৪৮০	৭৭৬	৪২৫	১৩৯	৩৮	৩৫০৮	৩৪৭৭
২০২১	১৩৮৪	৩১৬	৪৮০	৮৪২	৪২৫	১৩৯	৩৮	৩৬২৪	৩৫০০
২০২২	১৬৬২	৩১৬	৪৩২	৯০৮	৪২৫	১৩০	৩৮	৩৯১১	৩৭৬৯
২০২৩	১৭৮৬	৩১৬	৩৮৯	৯৭৪	৪২০	১২৫	৩৮	৪০৪৮	৩৯১৫
২০২৪	১৭৮০	৩১৬	৩৫০	১০৪০	৪৩১	১২০	৩৮	৪০৭৫	৪০৬১
২০২৫	১৮০৩	৩১৬	৩১৫	১১০৬	৪৪২	১১০	৩৮	৪১৩০	৪৩০০
২০২৬	১৮৪৪	৩১৭	২৮৩	১১৭২	৪৫৩	১০০	৩৮	৪২০৭	৪৩৫০
২০২৭	১৯৫৮	৩১৯	২৫৫	১২৩৮	৪৬৫	১০০	৩৮	৪৩৭৩	৪৪০০
২০২৮	২০৮৭	৩২১	২৩০	১৩০৪	৪৭৬	৭৫	৩৮	৪৫৩১	৪৪৫০
২০২৯	২০৬০	৩২৩	২০৭	১৩৭০	৪৮৮	৭৫	৩৮	৪৫৬১	৪৫০০
২০৩০	২০৫৮	৩২৫	১৮৬	১৪৪০	৫০০	৭৫	৩৮	৪৬২২	৪৬০০

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার

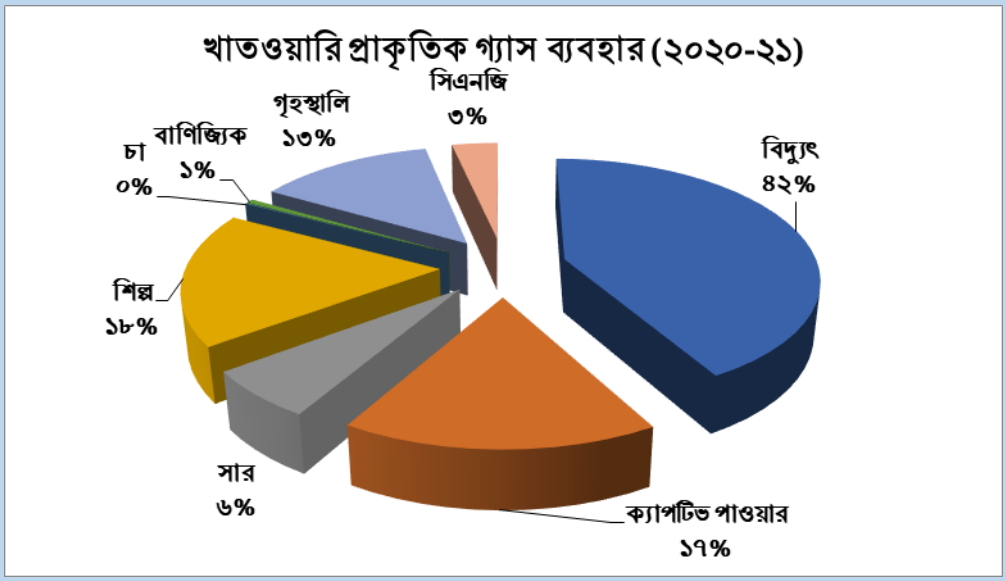

অনশোর এ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম

দেশের অনশোর অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত বাপেক্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১৯৮৯ সালের ৩ এপ্রিল কোম্পানি আইনের অধীনে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ একটি কোম্পানি হিসেবে বাপেক্স গঠিত হয় এবং পেট্রোবাংলার ভূতপূর্ব অনুসন্ধান পরিদপ্তর পৃথক করে নবগঠিত কোম্পানি ১ জুলাই ১৯৮৯ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে বাপেক্সকে কেবল অনুসন্ধান কোম্পানি নয়, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কোম্পানি হিসেবে পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।
বর্তমানে বাপেক্স তার সাতটি অনশোর গ্যাস ক্ষেত্র (সালদানাদি, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দরপুর, শ্রীকাইল এবং রূপগঞ্জ) থেকে প্রতিদিন প্রায় ১১০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদন করছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা হ্রাস করতে অবদান রাখছে। এছাড়াও এর আওতাধীন অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান এবং খনন কার্যক্রম, পেট্রোবাংলার অন্যান্য সংস্থার জন্য ড্রিলিং এবং ওয়ার্ক ওভার অপারেশন পরিচালনা করে আসছে। দেশে প্রাপ্ত ব্লকসমূহের বেশিরভাগই অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার দায়িত্ব বাপেক্সকে প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাপেক্স পর্যাপ্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি।

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য বর্তমানে দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানির মাধ্যমে জ্বালানি চাহিদা মিটানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। কারণ-

১. এলএনজি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি জ্বালানি হওয়ায় বিশ্বের খুব কম দেশই এ জ্বালানি ব্যবহার করে।

২. এই ব্যয়বহুল গ্যাসের মূল্য পরিশোধে গ্রাহকের সক্ষমতা সৃষ্টি না হলে রাষ্ট্রকে ধারাবাহিকভাবে যে ভর্তুকি দিতে হবে তার পরিমাণ অনেক হবে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বাড়বে ।

৪. অপচয় রোধের সক্ষমতা সৃষ্টি না করে আমদানী অব্যাহত রাখলে তা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ হবে।

৫. গ্যাস নির্ভর শিল্প ও শিল্প সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মিত হলে মূল্য যাই হোক সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে সেক্ষেত্রে বিদেশি উৎস নির্ভর জ্বালানি সরবরাহে আর্ন্তজাতিক কোন কারণে বাঁধার সৃষ্টি হলে বিনিয়োগ সম্পূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, মূলধন পরিশোধের অসামর্থতা দেখা দিবে। হঠাৎ বেকারত্বের চাপ বৃদ্ধি পাবে।

৬. সর্বোপরি বৈদেশিক উৎস নির্ভর জ্বালানি হওয়ায় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে।

এ সমস্ত কারণে আমদানিকৃত এলএনজির উপর নির্ভরশীলতা যতটা কম করা যায় ততই মঙ্গল। এ উদ্দেশ্যে দেশীয় গ্যাস উৎপাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

দেশজ গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ এখনও অনেক বাকি আছে। সম্ভাব্য স্থানগুলোতে চূড়ান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম এখনও গ্রহণ করা হয়নি যা হতে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশে গ্যাসের রিজার্ভ আর নেই । এ কারণে স্থলভাগে এবং সমুদ্রাঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া বিশ্বের যে সব এলাকায় তেল-গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেখানে কনভেনশনাল রিজার্ভার ছাড়াও বর্তমানে আনকনভেনশনাল রিজার্ভ থেকে তেল, গ্যাস আরোহণের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। আনকনভেনশনাল মজুদ বলতে প্রচলিত ধরনের ট্রাপের পরিবর্তে হরিজেনটাল স্যান্ড লেয়ার অথবা অয়েল শেলকে বুঝায়। উদাহরণ হিসেবে-কনভেনশনাল রিজার্ভ শেষ হওয়ার পরেও আনকনভেনশনাল রিজার্ভ থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে তেল উৎপাদনে কানাডা বিশেষ সাফল্য দেখিয়ে চলছে।

এ প্রেক্ষিতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে।

১। প্রচলিত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পাশাপাশি হরিজেনটাল ড্রিলিং এবং আনকনভেনশনাল রিজার্ভার অনুসন্ধানের কার্যক্রমও জোরদার করার প্রয়োজন।

২। বর্তমান গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক ফ্র্যাকিং প্রযুক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আংশিক অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদিত অথবা অনুসন্ধানের কোন এক পর্যায়ে দেশীয় অথবা বিদেশী কোম্পানি দ্বারা পরিত্যাক্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমগুলির কারণ পর্যালোচনা করে পুনরায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জোরালো অনুসন্ধান কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন।

৪। অনশোর এলকায় সম্ভাবনাময় বিশাল এলাকা বর্তমানে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাপেক্স কর্তৃক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। বাপেক্সের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনশোরের অনুসন্ধান ধীর গতিতে চলছে। এই গতি বৃদ্ধির জন্য যা করা যেতে পারে-

ক. বাপেক্সে সার্বক্ষণিক এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা যেতে পারে, ডাটা এনালাইসিস থেকে শুরু করে অনুসন্ধানের সকল কাজে তাদের পরামর্শ প্রদানের জন্য সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

খ. সম্ভাব্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির সাথে জয়েন্ট ভেন্চারের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ. কিছু ব্লক বাপেক্সের আওতা বর্হিভূত করে অনশোর বিডিং রাউন্ড শুরু করা।

অফশোর এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উৎপাদন বন্টন চুক্তি-২০১৯ হালনাগাদ করা হয়েছে। যেখানে অফশোর অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করার জন্য বেশ কিছু ইনসেনটিভ এর সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া অফশোর বিডিং রাউন্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য প্রাথমিক তথ্যের সুবিধার্থে ২ডি মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভের কনট্রাক্টরকে নিয়োজিত করা হয়েছে। সাগর অঞ্চলকে দুটি জোনে ভাগ করে সাইমলটুনিয়াসলি বিডিং রাউন্ড শুরু করা হলে মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে এবং সমুদ্র অনুসন্ধান কার্যক্রম উভয় ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমানে বাপেক্স এর অনশোরে চলমান প্রকল্পসমূহ

শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfd ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্পঃ ১ জুলাই, ২০২০ - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ (পরিঃ)।

প্রকল্পের মূল কাজ

- টার্নকী ভিত্তিতে একটি ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ, স্থাপন ও কমিশনিং করা;
- শাহবাজপুর ইস্ট-১ কূপ হতে বর্তমান গ্যাস ক্ষেত্র পর্যন্ত ৪ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস গ্যাদারিং লাইন পাইপ সংগ্রহ ও স্থাপন করা।

২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প। জানুয়ারি ২০২১ - ৩০জুন ২০৩০ পর্যন্ত

- টার্ন কী ভিত্তিতে গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১ এবং ১টি মূল্যায়ন কাম কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন, পরীক্ষণ এবং কমপ্লশিন করা।

শরিয়তপুর-১ কূপ খনন প্রকল্প। ১ জুলাই ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

- শরিয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ ৩২০০ (১০০) মিটার (TVDss) গভীরতায় খনন, পরীক্ষণ এবং কমপ্লিশন করা।

বিজয়-১০, ১১, ১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প। জুলাই ২০২১ – ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

- ৪টি রিগ মেরামত এবং ১টি রিগ আপগ্রেডেশন করতঃ বাপেক্সের অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং ওয়ার্কওভার কূপ খনন কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে খনন কার্যক্রমে গতিশীলতা অর্জন করা।

২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এন্ড ২২। জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪

- বাপেক্স ও সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে ৩০০০ লাইন কি.মি. দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ সম্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ কাজ সম্পাদন।
- অনুসন্ধন ব্লক ১৫ ও ২২ এ সম্ভাবনাময় লিডস এবং প্রসপেক্ট সমূহ চিহ্নিতকরণ ও খনন যোগ্য ভূকাঠামো সনাক্তকরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বন রিসোর্স নিরূপন।
- দ্বিমাত্রিক জরিপের জন্য যন্ত্রপাতি ও আনুসাঙ্গিক মালামাল ক্রয় সম্পন্নকরণ
- অস্থায়ী জনবল ও যানবাহন সেবা ভাড়াকরণ।

শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন। ১ জুলাই ২০২১ – ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

- টার্ন কী ভিত্তিতে প্রতিটি ১০ mmcfd ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি (২টি অপারেশনাল ও ১টি স্ট্যান্ডবাই) টু স্টেজ ওয়েলহেড কম্প্রেসর ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটি ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ, স্থাপন/নির্মাণ ও কমশিনিং এবং বাপেক্স ও ঠিকাদার কর্তৃক ১ বছর যৌথ পরিচালনা
- প্রোডাকশন ফোরক্যাস্টিং এবং প্লান্ট সিমুলেশন সফটওয়ার সংগ্রহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নে PSC এর আওতাধীন গৃহীত কার্যক্রম

প্রথম রাউন্ড PSC সমূহ

ব্লক #১২ এবং #১৩/১৪

এই ব্লকগুলি এখন দুটি পৃথক পিএসসি চুক্তির আওতায়, অপারেটর হিসাবে শেভরন সহ পরিচালিত হচ্ছে। শেভরন বাংলাদেশ তিনটি গ্যাসক্ষেত্রের বর্তমান অপারেটর, অন্য ব্লকগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। এই পিএসসির চুক্তির শর্তাবলী প্রকৃতিতে একই ধরণের, কেবল ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র ব্যতীত যার আয়তন ৬৩.৮ বর্গকিমি, মূল্যায়ন এবং উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিকাদার এবং পেট্রোবাংলার উৎপাদন শেয়ার নেয়ার অনুপাত ছিল ৭৫:২৫ অনুসারে।

ব্লক #১৬

এই ব্লকটি চট্টগ্রাম, মনপুরা, হাতিয়া, সন্দীপ এবং বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন অঞ্চলগুলি জুড়ে রয়েছে। ব্লকের মালিকানা হ'ল কেয়ার্ন এনার্জি সাঙ্গু ফিল্ড লিমিটেড (৩৭.৫%), স্যান্টোস বাংলাদেশ লিমিটেড (৩৭.৫%), এবং হলিবার্টন ব্রাউন এন্ড রুট (২৫%)।

পরিত্যক্ত ব্লকসমূহ

তিনটি অনুসন্ধানের কূপ ড্রিল করার পরে কোনও বাণিজ্যিক আবিষ্কার ব্যতীতই ২০০৫-এ ব্লক ১৫ কেয়ার্ন এনার্জি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্লক ২২ একটি মার্কিন সংস্থা, ইউনাইটেড মেরিডিয়ান কর্পোরেশনকে প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা ব্লকটি Ocean Energy কে অর্পণ করে। কাজের প্রোগ্রাম পূরণ না করার কারণে পিএসসি টি বাতিল করা হয়েছিল।

মডেল পিএসসি-১৯৯৭ ভিত্তিক পিএসসি সমূহ

বর্তমানে মডেল পিএসসি-১৯৯৭ ভিত্তিক দুটি সক্রিয় পিএসসি রয়েছে। ব্লক ৭ শেভরন বাংলাদেশ দ্বারা এবং ব্লক ৯ নাইকো এবং বাপেক্সের অংশীদারিত্বের সাথে টাল্লো অয়েল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ব্লক ৯ এ অনুসন্ধান এবং মূল্যায়ন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এটি এখন উত্পাদনের পর্যায়ে রয়েছে, বাঙ্গুরা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্পাদিত হচ্ছে।

ব্লক ৫ এবং ১০ ও মডেল পিএসসি -১৯৯৭ ভিত্তিক ছিল।কেয়ার্ন এনার্জি পিএলসি তাদের পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এই ব্লকগুলি ভৌগলিক পদ্ধতিতে (geophysical methods) জরিপ করা হয়েছিল। অপারেটর কূপ খননের জন্য কোনও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খুঁজে পায় নি এবং পরিত্যক্ত ঘোষণার নোটিশ জারি করেছিল। ব্লকগুলি বর্তমানে উন্মুক্ত। অব্যবহৃত ড্রিলিং সামগ্রী পিএসসির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোবাংলার কাছে প্রদান করা হয়েছে।

বাপেক্স/নাইকো রিসোর্সেস জয়েন্ট ভেঞ্চার

বাপেক্স / নাইকো জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট (জেভিএ) হ'ল বাংলাদেশে যৌথ উদ্যোগ চুক্তির আওতায় কার্যকর একমাত্র পেট্রোলিয়াম চুক্তি। ১৯৯৭ সালে ব্লক ৯-তে একটি পিএসসির মাধ্যমে নাইকো দ্বিতীয় বিডিং রাউন্ডে অংশ নিয়েছিল, তবে নাইকোকে প্রযুক্তিগতভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে, নাইকো অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে ব্লক ৯ পিএসসির অংশীদার হয়ে ওঠে। ২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর বাপেক্স ও নাইকোর মধ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এগ্রিমেন্টটি সাবলীলভাবে এগিয়ে যায়নি। নাইকো ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় চুক্তি (জিপিএসএ) ছাড়াই ফেনী গ্যাস ক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্যাস পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু করে। পেট্রোবাংলা সরবরাহ করা গ্যাসের বিপরীতে নাইকোকে ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৬ এ পেট্রোবাংলার সাথে গ্যাসের ওয়েলহেড প্রাইস নির্ধারণ না করে একটি জিপিএসএ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওয়েলহেডের দাম ১.৭৫ মার্কিন ডলার / এমসিএফ নির্ধারণ করা হয়।

মডেল পিএসসি-২০০৮ ভিত্তিক অফশোর বিডিং

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-এ পেট্রোবাংলা ২৮ টি অফশোর ব্লকের জন্য অফশোর বিডিং রাউন্ড ঘোষণা করেছিল, সেখানে ৮ টি অগভীর সমুদ্র (এসএস) ব্লক (টাইপ-এ ব্লক হিসাবে পরিচিত), এবং ২০ টি গভীর সমুদ্র (ডিএস) ব্লক (টাইপ-বি ব্লক বিডিং) ছিল। প্রক্রিয়াটি ৭ ই মে, ২০০৮ এ শেষ হয়। সাতটি সংস্থা ১৫ টি ব্লকের জন্য বিড জমা দেয়। ঘোষিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে, মূল্যায়ন কমিটি ৯টি ব্লকের জন্য দুটি আন্তর্জাতিক তেল সংস্থার (মার্কিন-ভিত্তিক কনোকো-ফিলিপস এবং আইরিশ সংস্থা টাল্লো) সুপারিশ করেছিল। কয়েকটি ব্লক নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সামুদ্রিক বিরোধের কারণে, অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি দুটি সংস্থাকে মাত্র তিনটি অফশোর ব্লক প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে: একটি অগভীর সমুদ্র ব্লক (এসএস-০৮-০৫) টাল্লোকে এবং দুটি গভীর সমুদ্র ব্লককে (ডিএস-০৮-১০ এবং ডিএস-০৮-১১) কনোকো-ফিলিপসকে। আইওসি-র সাথে আলোচনা হচ্ছিল এবং চূড়ান্ত চুক্তির প্রক্রিয়াটি ২০১০ সালের অক্টোবরে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ হাইকোর্ট ১৭ নভেম্বর, ২০০৯ এ অনশোর বিডিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে এবং পেট্রোবাংলা বিড এর পরবর্তী দফায় ১৭ টি ব্লক খোলার পরিকল্পনা করে। বিডিংটি ২০১২ মডেল পিএসসি ভিত্তিতে করা হয়।

উৎপাদন বন্টন চুক্তির (পিএসসি) আওতায় আইওসিসমুহের কার্যক্রম

- মোট ব্লক : ৪৮টি
  - অনশোর : ২২টি
  - অফশোর : ২৬টি (অগভীর-১১; গভীর-১৫)
- পিএসসিভুক্ত ব্লক সংখ্যা : ৮টি (অনশোর-৪, অগভীর-৩; গভীর-১)
- বিদ্যমান পিএসসি'র সংখ্যা : ৭টি (অনশোর-৩, অগভীর-৩; গভীর-১)
- কর্মরত আইওসি'র সংখ্যা : ৭টি
- আইওসি কর্তৃক গ্যাস উৎপাদন : প্রায় ১,৬০০ এমএমসিএফডি
- আইওসি কর্তৃক কনডেনসেট উৎপাদন : প্রায় ৯,৫০০ ব্যারেল
- গ্যাস উত্তোলনরত ব্লক ও গ্যাসক্ষেত্র :

শেভরন : ব্লক ১২ (হবিগঞ্জ – বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র)
: ব্লক ১৩ (মৌলভীবাজার – মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র)
: ব্লক ১৪ (সিলেট – জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র)

তাল্লো/ক্রিস : ব্লক ৯ (কুমিল্লা – বাঙ্গুরা গ্যাসক্ষেত্র)

প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)

বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০১২ এর আওতায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি ONGC Videsh Ltd. (OVL), Oil India Ltd. (OIL) ও BAPEX এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখ ব্লক SS-04 ও SS-09 এর জন্য স্বাক্ষরিত দু'টি পিএসসি'র আওতায় এ ব্লকদ্বয়ে ৫,৫২৮ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ ও ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পিএসসি মোতাবেক ব্লক SS-04 এ দুটি ও SS-09 এ একটি ড্রিলিং লোকেশন চিহ্নিত করাহয়েছে। ব্লক SS-04 এ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়কালে অনুসন্ধান কূপ কাঞ্চন-১ খনন খনন করা হয়েছে যা থেকে কোন গ্যাস পাওয়া যায়নি। এছাড়াও, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিমাসের মধ্যে SS-04 এবং SS-09 ব্লকে আরও ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি Santos, KrisEnergy ও BAPEX-এর সাথে ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখ অফশোর ব্লক SS-11 এর জন্য স্বাক্ষরিত পিএসসি'র আওতায় ২০১৫ সালে ৩,২২০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ এবং পরবর্তীতে মে, ২০১৮ সালে এ ব্লকে ৩০৫ বর্গকিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। Santos এশিয়া অঞ্চল হতে সমস্ত কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলায় ২০২০ সালে তারা ব্লকটি অবমুক্ত করে। গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সঙ্গে ১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এ ব্লকে ৩,৫৮০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আর্থিক শর্তাবলী পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য তাদের নিকট আকর্ষনীয় না হওয়ায় তারা ২০২১ সালেব্লকটি অবমুক্ত করে।কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নতুনভাবে বিনিয়োগ ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ায় আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯-কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগপোযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করা হচ্ছে। অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ যুগোপযোগী করে চূড়ান্তপূর্বক নতুন বিডিং রাউন্ড ঘোষণা করা হবে। স্থলভাগে শেভরন পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের বর্তমান উচ্চ গ্যাস উৎপাদন সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য বিবিয়ানা প্রসেস অপটিমাইজেশন নামক চলমান প্রকল্পের কাজ ২০২৩ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প শেষে ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত উচ্চহারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান জিওলজিকাল স্ট্রাকচারের Flank Area হতে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে গৃহীত ২০২২-২৩ সালে বিবিয়ানা-২৭ নামক কূপ খনন প্রকল্পে আশানুরূপ গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের বর্তমান গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি পাবে এবং আরও কূপ খনন ও নতুন প্যাড স্থাপনের মাধ্যমে বর্ধিত রিজার্ভের গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে পিএসসির আওতাধীন ৪টি গাসক্ষেত্র হতে দৈনিক প্রায় ১,৫১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে, যা মোট গ্যাস উৎপাদনের ৬৪%।

চিত্র ১: ব্লকভিত্তিক পিএসসি কার্যক্রম

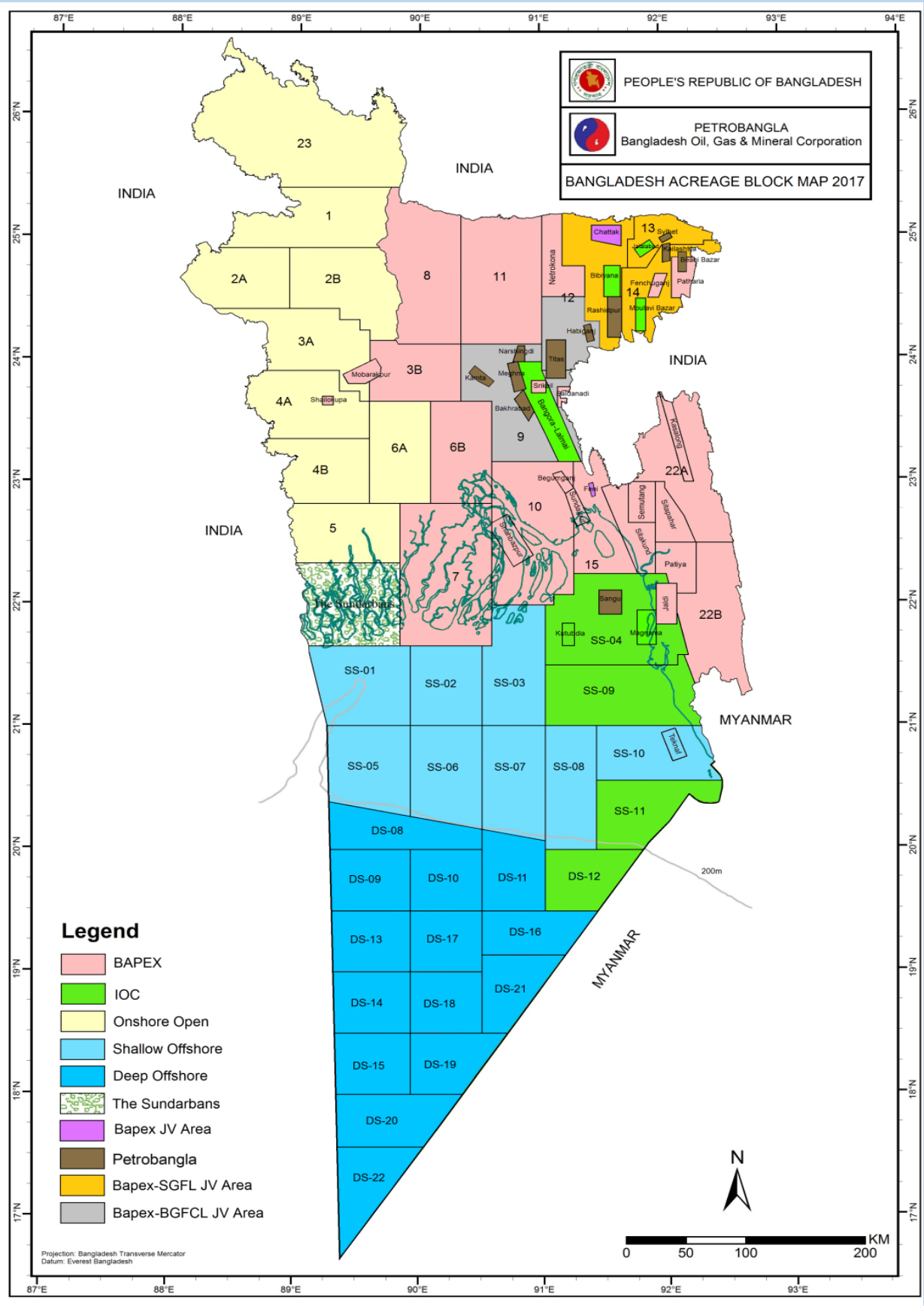

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা (ইইজেড) এবং এর পরবর্তী মহীসোপানসহ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের আইনগত স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। এর ফলে বিশাল সমুদ্র এলাকায় জ্বালানি অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারের সুনীল অর্থনীতি কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে পেট্রোবাংলা ৩টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে, Fast Track কার্যক্রম হিসাবে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য TGS-SCHLUMBERGER-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আওতায় এ বছরের শেষ নাগাদ সার্ভে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নতুনভাবে বিনিয়োগ ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ায় আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯-কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও যুগপোযোগী ও প্রতিযোগিতামূলক করার কাজ চলমান রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৯ যুগোপযোগী করে চূড়ান্তপূর্বক নতুন বিডিং রাউন্ড ঘোষণা করা হবে। অপর স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে SS-04 ব্লকে আরও একটি অনুসন্ধান কূপ (তিতলি-১) ও SS-09 ব্লকে একটি অনুসন্ধান কূপ (মৈত্রি-১) খননের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ইস্টার্ন ফোল্ড বেল্টের সমস্ত সম্ভাবনা Explore/Revisit করা

- ✓ **পাটিয়া কাঠামোয় ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড দ্বারা সর্বপ্রথম খনন করা হয়েছিল এবং সেখানে হাইড্রোকার্বনের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খননকৃত কূপ কোনকিছু আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে।**
- ✓ **১৯৬৫-১৯৭০ সালে জালদি ক্ষেত্রে তিনটি কূপ খনন করা হয়েছিল কিন্তু বাণিজ্যিক কোন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি**
- ✓ **সীতাকুন্ড** 5, 1983-1988 (5 বছর) **তে পেট্রোবাংলা অক্ষীয় ক্রেস্ট বরাবর** 4005 **মিটার খনন করে**
- ✓ **১৯৮৮ সালে সীতপাহার কাঠামোয় শেল অয়েল কোম্পানী দ্বারা** 1,506 **মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ ড্রিল করা হয়েছিল, তবে পরে তা স্থগিত করতে হয়েছিল।**
- ✓ 1989 **সালে, বাপেক্স পাথারিয়া এন্টিক্লাইনে একটি ক্রেস্টাল পজিশনে পাথারিয়া** -5 **কূপ ড্রিল করে।** 34 **ডিগ্রী এর অস্বাভাবিক গর্ত বিচ্যুতির কারণে তা পরিত্যক্ত হয়।**

এই ক্ষেত্রগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Explore/Revisit **করা প্রয়োজন।**

গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন

পাঁচ ধরণের গ্যাস রিসোর্স রয়েছে:

১. Identified Prospects এবং Leads
২. Unmapped
৩. শেল গ্যাস এবং শেল অয়েল
৪. থিন বেডস
৫. কোলবেড মিথেন

টেবিল ৫: এক নজরে গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন (UNRISKED)

	গ্যাস রিসোর্স, BCF		
রিসোর্সের ধরণ	**P_{90}**	**P_{50}**	**P_{10}**
Identified Prospects	41,940	57,013	76,315
Identified Leads	166,442	219,088	279,971
Unmapped	881.2	6080.4	34948.6
শেল গ্যাস এবং শেল অয়েল	100,169	234,812	473,278
থিন বেডস	0	10,872	27,252
মোট সম্ভাব্য রিসোর্স	**309,432**	**527,865**	**891,765**
কোলবেড মিথেন	845	1,040	1,275
মোট কন্টিনজেন্ট রিসোর্স	**845**	**1040**	**1275**

টেবিল ৬: একনজরে তেল/কনডেনসেট রিসোর্স প্রাক্কলন (UNRISKED)

	তেল/কনডেনসেট রিসোর্স, MMBO		
রিসোর্সের ধরণ	**$P_{৯০}$**	**$P_{৫০}$**	**$P_{১০}$**
Identified Prospects	০	০	০
Identified Leads	০	০	০
Unmapped	৩	২৬	১৬৮
শেল গ্যাস এবং শেল অয়েল	১,০৬৩	২,৯৫৩	৬,৭৩৩
থিন বেডস	০	০	০
মোট সম্ভাব্য রিসোর্স	**১,০৬৬**	**২,৯৭৯**	**৬,৯০১**
কোলবেড মিথেন	০	০	০
মোট কন্টিনজেন্ট রিসোর্স	**০**	**০**	**০**

টেবিল ৭: এক নজরে গ্যাস রিসোর্স প্রাক্কলন (RISKED)

	গ্যাস রিসোর্স, BCF		
রিসোর্সের ধরণ	**$P_{৯০}$**	**$P_{৫০}$**	**$P_{১০}$**
Identified Prospects	১২,৫১০	১৯,২৯৫	২৮,২৫৯
Identified Leads	২১,৮৪৪	৩৪,০৫৭	৪৯,৭১৯
Unmapped	৬৫	৪৪৩	২,৫৪৮
শেল গ্যাস	৪,০০৭	৯,৩৯২	১৮,৯৩১
মোট সম্ভাব্য রিসোর্স	**৩৮,৪২৬**	**৬৩,১৮৯**	**৯৯,৪৫৭**
কোলবেড মিথেন	৩৪৬	৪২৬	৫২২
মোট কন্টিনজেন্ট রিসোর্স	**৩৪৬**	**৪২৬**	**৫২২**

Unconventional Hydrocarbon Reservoir

প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত গ্যাস ছাড়াও দেশে অপ্রচলিত ধরণের কিছু গ্যাস রিসোর্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টাইট গ্যাস, থিন বেড, শেল গ্যাস, গ্যাস হাইড্রেট, কোল বেড মিথেন প্রভৃতি। এছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ছাড়াও UCG (Underground Coal Gaification) পদ্ধতিতে কয়লা পুড়িয়ে গ্যাসে পরিণত করে উত্তোলন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- গ্যাসের ঘাটতি নিরসণের লক্ষ্যে কক্সবাজারের মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের প্রথম ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) হতে ১৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ বানিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি (গ্যাস) সরবরাহ শুরু হয়েছে। এছাড়া, দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন অপর একটি FSRU হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ বানিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। জি-টু-জি ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত দু'টি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি এবং স্পট মার্কেট হতে ও এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি Land Based LNG Terminal নির্মাণের বিষয় "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০" এর আওতায় সম্পাদনে সরকার অনুমোদন প্রদান করেছে। তদপ্রেক্ষিতে, Feasibility Study কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতোপূর্বে শর্ট লিস্টকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে Terminal Developer Selection এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাসের চাহিদার উপর ভিত্তি করে আরও এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন ও প্রয়োজনীয় এলএনজি আমদানি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

*চিত্র*২: মহেশখালী এল এন জি টার্মিনাল

টেবিল ৮: একনজরে এলএনজি আমদানি চিত্র

মোট এলএনজি আমদানি মার্চ ২০২২	২০.৮৭	Bcf	০.০২	Tcf
মোট এলএনজি আমদানি জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২	১৭৩.১৭	Bcf	০.১৭	Tcf
ক্রমপুঞ্জীত এলএনজি আমদানি আগস্ট ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২	৭০৮.০৩	Bcf	০.৭১	Tcf

বর্তমানে ২x৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানি পরবর্তী অবস্থাঃ

বিদ্যুৎ খাতে পূর্বে প্রায় ৫৭% (৪০% বিদ্যুৎ+১৭%ক্যাপটিভ) এবং শিল্পখাতে ১৭% গ্যাস সরবরাহ করা হত। শিল্পখাতে প্রচুর চাহিদা সত্ত্বেও গ্যাস স্বল্পতা হেতু সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় নাই। বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন খাতে গ্যাস বরাদ্দের বিষয়টি পূণর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এজন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

১। দেশের বেশির ভাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনেক পুরাতন হওয়ায় এদের জ্বালানি দক্ষতা অত্যন্ত কম। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন করে জ্বালানি দক্ষতার উন্নতির (কো জেনারেশন/ট্রাই জেনারেশন) মাধ্যমে সম পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

২। বিদ্যুতের চেয়ে শিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৩। সার খাতে দেশের মোট গ্যাসের প্রায় ৫% ব্যবহৃত হচ্ছে। এখাতে আর অতিরিক্ত বরাদ্দ ব্যতিরেকে জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত গ্যাস দিয়েই অধিক পরিমাণ সার উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া, ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানি না করে সার আমদানির মাধ্যমেও অতিরিক্ত সারের চাহিদা পূরন করা যেতে পারে।

৪। আবাসিক খাতে আরও অধিক গ্যাস সরবরাহ না করে বিকল্প এলপিজি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর থেকে চাপ হ্রাস করা যায়।

৫। সিএনজি খাতেও গ্যাসের বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে বিকল্প অটোগ্যাস ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।

৬। ক্যাপটিভেও দেশের মোট গ্যাসের ১৭% ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ও মানসম্মত বিদ্যুৎ প্রদানে অঙ্গীকারের ফলে ভবিষ্যতে ক্যাপটিভ খাতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি বিশেষ পূণর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া জ্বালানি দক্ষতা (কো জেনারেশন/ ট্রাই জেনারেশন) বিষয়টি বিবেচনা করে ক্যাপটিভ খাতে গ্যাস সাশ্রয় করা সম্ভব।

৭। ক্রস বর্ডার বিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমেও ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতে গ্যাসের ব্যবহার সাশ্রয় করা সম্ভব।

৮। আইপিপিগণ কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে বিকল্প সরাসরি আমদানিকৃত এলএনজি এর মাধ্যমে উৎপাদিত হলে দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় হবে।

৯। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর থেকে চাপ কমানো সম্ভব।

১০। ইলেকট্রিক/ ফুয়েল সেল সমৃদ্ধ মোটরযানের ব্যবহার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার সাশ্রয় করা সম্ভব।

এভাবে সাশ্রয়কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন/শিল্প সংযোগ সম্ভব।

কয়লা

কয়লা (Coal) জলমগ্ন পরিবেশে উদ্ভিদরাজীর সুদীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়ে থাকার ফলে উৎপন্ন কালো অথবা গাঢ় বাদামি বর্ণের খনিজ পদার্থ। কয়লার প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে। রাসায়নিক শিল্পেও এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শ' শতাব্দী পর্যন্ত কয়লাই ছিল শক্তির বাণিজ্যিক উৎসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ। পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর এর ব্যবহার কিছুটা লোপ পেলেও বর্তমানে এটি পৃথিবীব্যাপী শক্তির উৎস হিসেবে জোড়দার ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ভারতের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে: বেঙ্গল-বিহার কোল ফিল্ডস -এর ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকরাও ও করণপুরাতে অবস্থিত কয়লা খনিসমূহ। ভারতে প্রথম কয়লা উত্তোলন শুরু হয় ১৭৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র থেকে। সে সময় শুধু স্থানীয় চাহিদাকে সামনে রেখে কয়লা উত্তোলন করা হতো। কিন্তু ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে চালুর পর ব্যাপকভাবে কয়লা আহরণের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে রেলপথ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৩ সাল নাগাদ রাণীগঞ্জের কয়লা খনি থেকে ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৪১.২ ভাগ উৎপাদিত হতো। একইভাবে ১৮৯৪ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ব্যবস্থার একটি শাখাপথ ঝরিয়া কয়লা খনিকে সংযুক্ত করলে এ খনির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ১৪,৮১৮ টন-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৩ সাল নাগাদ ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হতো ঝরিয়া কয়লা খনি থেকে। ভারতের আসাম রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কয়লা খনিসমূহ টারশিয়ারী যুগের শিলাস্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

চিত্র ৩: বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

বাংলাদেশে এ যাবতকাল পর্যন্ত পাঁচটি প্রধান অন্তর্ভূপৃষ্ঠীয় (sub-surface) কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভূতত্ত্ববিদ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভূভাগের নিচে বিরাট আকারের কয়লাখনির অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। ভূতাত্ত্বিকগণের উপরিউক্ত মতামতের ভিত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের কয়লাসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভূগর্ভের ভূতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা।

বাংলাদেশে গন্ডোয়ানা কয়লার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানকার্য ছিল অবহেলিত। ১৯৫৯ সালে স্টানভাক (STANVAC) কোম্পানি বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করার সময় এদেশে উন্নতমানের খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির অনুমান যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। এসময় স্টানভাক বগুড়া জেলার কুচমাতে Kuchma X-1 নামক কূপ খনন করতে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৩৮১ মিটার গভীরতায় গন্ডোয়ানা কয়লার সন্ধান লাভ করে। স্টানভাক কোম্পানি প্রথমদিকে কূপটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেও পরবর্তী সময়ে খননকাজ চালাতে গিয়ে এ কয়লাখনি আবিষ্কার করে। কূপে কয়লাস্তর ছাড়াও পুরু ইয়োসিন চুনাপাথর স্তর আবিষ্কৃত হয়। এ কয়লাখনির আবিষ্কার বাংলাদেশে আহরণযোগ্য গভীরতায় খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালে পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জি.এস.পি) ইউএন-পাক মিনারেল সার্ভে প্রজেক্টের আওতায় বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থীয় জরিপ ও খননকার্য পরিচালনা করে। এ জরিপ ও খননকার্যের ফলে ১,০৫০ মিলিয়ন টন মজুত সমৃদ্ধ জামালগঞ্জ-পাহাড়পুর কয়লা খনি এবং প্রচুর পরিমাণে ইয়োসিন চুনাপাথরের মজুত আবিষ্কৃত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বা জি.এস.বি ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়াতে, ১৯৮৯ সালে রংপুর জেলার খালাশপীর নামক স্থানে এবং ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরের দীঘিপাড়াতে পার্মিয়ান যুগের গন্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কার করে। বড়পুকুরিয়া কয়লা অববাহিকায় ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে জি.এস.বি ৭টি উত্তোলন কূপ (drill holes)

খনন করতে সক্ষম হয়। জি.এস.বি এ কয়লাক্ষেত্রের মজুত, গুরুত্ব ও বিস্তার নির্ণয় করতেও সমর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে খনির বিস্তৃতি, মজুদ, পুরুত্ব, কয়লাস্তরের অবস্থা, অধিচাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং জল-ভূতাত্ত্বিক (hydrogeological) পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার লক্ষ্যে চীনা ও ব্রিটিশ কোম্পানিসমূহ আরও ২৫টি কূপ খনন করে। এ ছাড়া, জি.এস.বি খালাসপীর কয়লাক্ষেত্রে ৪টি এবং দিঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রে একটি উত্তোলন কূপ খনন করে।

চিত্র ৪: কয়লা খনির পাতালপথ, বড়পুকুরিয়া

যুক্তরাজ্যের ওয়ারডেল আর্মষ্ট্রং (Wardell Armstrong) ১৯৯০ সালে বড়পুকুরিয়া কয়লার কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইকার্য পরিচালনা করে। ভূ-পৃষ্ঠের ১১৮ মিটার গভীরতা থেকে ৫০৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এবং বিস্তৃতিতে প্রায় ৫.২৫ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে বড়পুকুরিয়া কয়লা অবস্থান করছে বলে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এ কয়লাক্ষেত্রে মোট মজুত ৩০০ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য মজুত ৭০ মিলিয়ন টন। এ কয়লা অধিক মাত্রায় উদ্বায়ী ও নিম্নমাত্রার সালফার বিটুমিনাস ধরনের। কয়লা উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশ সরকার চীনা কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পেট্রোবাংলা এ খনির যাবতীয় নির্বাহী দায়-দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান। কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে ভূ-পৃষ্ঠের ২৮০ মিটার গভীরতায় বিদ্যমান কয়লাস্তর ভেদ করে ৬ মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি খাড়া সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে ২০০৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হতে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক এক মিলিয়ন মেট্রিক টন অথবা দৈনিক তিন হাজার তিনশত টন। কিন্তু খনন কার্যের অনভিজ্ঞতা, খনি দূর্ঘটনা, ভূকম্পন প্রভৃতি প্রতিকূলতার কারণে এখন পর্যন্ত সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বরং খনিটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই খনি বিশেষজ্ঞরা বড়পুকুরিয়া থেকে ভূগর্ভস্থ খনি পদ্ধতির পাশাপাশি উন্মুক্ত খনন পদ্ধতিতেও কয়লা উত্তোলন করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। এটি সম্ভব হলে মোট মজুতের প্রায় ৯০ শতাংশ আহরণ করা সম্ভব হবে যা একদিকে বাংলাদেশের রাজস্বখাতকে যেমন প্রভাবিত করবে তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান জ্বালানি সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে।

জামালগঞ্জ-পাহাড়পুর কয়লাক্ষেত্রে বিদ্যমান কয়লাস্তরের গভীরতা অত্যধিক হওয়ায় কয়লা উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের পরিবর্তে কয়লাস্তর মিথেন (Coal Bed Methane) গ্যাস আহরণ ও উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর অবকাশ রয়েছে। এছাড়াও সর্বাধুনিক আরও একটি পদ্ধতি ইউসিজি অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কয়লা হতে গ্যাসে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও বিবেচনায় আসছে এবং তা পদ্ধতিগতভাবে এবং পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হবে কিনা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্ম চলছে।

চিত্র ৫: ড্রিলিং পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ, বড়পুকুরিয়া

খালাশপীর ও দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রের কয়লা বড়পুকুরিয়া কয়লার মতো একই জাতীয় তবে এ দু কয়লাক্ষেত্রের বিস্তৃতি, মজুত ও পুরুত্বসহ বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এখনও সম্পন্ন হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার ব্রোকেন হিল প্রোপ্রাইটর (Broken Hill Proprietor) ১৯৯৭ সালে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে ভূ-পৃষ্ঠের ১৫০ মিটার গভীরে গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কার করে। ফুলবাড়ী প্রকল্পের কয়লা উত্তোলন নিয়ে সরকার ও তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে। সরকার চাচ্ছে যে উন্মুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করা হোক। এতে ৮০ ভাগ পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করা যাবে। এ ব্যাপারে জার্মানীর কোলন শহরের পার্শ্ববর্তী হামবাঘ কয়লা খনির উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। তবে কথা উঠেছে যে বাংলাদেশের মাটির গঠন, পানির গভীরতা, বৃষ্টি ও বন্যার ধরণ জার্মানী থেকে ভিন্ন এবং তা কোনভাবেই উন্মুক্ত খননপদ্ধতির উপযোগী নয়। এতে কৃষি ভূমি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে, মৎস্য সম্পদ এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

এদিকে সরকার গঠিত কমিটির মতে যদি উন্মুক্ত পদ্ধতির বদলে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তবে সেখান থেকে মোট কয়লার মাত্র ১০ ভাগ কয়লা উত্তোলন করা যাবে যা অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক। তাছাড়া বিদেশি কোম্পানি যে নিয়মে এই কয়লা উত্তোলনের প্রস্তাব দিয়েছে তাও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সরকারকে খুব শিগগিরই একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পার্মিয়ান গন্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্র সমূহ ছাড়াও জি.এস.পি ১৯৬০-৬২ সালে বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্ত বরাবর সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট-বাগলিবাজার এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ৪৫ মিটার থেকে ৯৭ মিটার গভীরতায় টারশিয়ারী কয়লাক্ষেত্রের দুটি স্তর আবিষ্কার করে। এ কয়লা লিগনোবিটুমিনাস জাতীয়। কয়লা স্তরদুটির পুরুত্ব যথাক্রমে ০.৯০ মিটার ও ১.৭০ মিটার এবং অনুমিত মজুতের পরিমাণ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন টন।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও এর ওপর দেশের জ্বালানি খাতের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় দেশে জ্বালানির বহুমুখীকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা খনির মধ্যে একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া। এ খনির কয়লা উত্তোলন ক্ষমতা বার্ষিক ১০ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই খনি থেকে দৈনিক গড়ে ১,২০০-১,৮০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হতো, বর্তমানে সেখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি **লংওয়াল টপ কোল কেভিং** পদ্ধতিতে (এলটিসিসি) গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫% বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়ায় ৬২৭.৭৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ২৯৯ অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদেরকে জনপ্রতি ২.০০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ১টি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর ২টি স্টাডি চলমান আছে।

টেবিল ৯: দেশের সকল কয়লাক্ষেত্রের অবস্থান চিত্র

কয়লা ক্ষেত্র	জেলা	আয়তন (ব:কিমি:)	কয়লার সীমের গভীরতা (মি:)	গড় সালফার %	গড় ক্যালোরিফিক ভ্যালু (বিটিইউ)	জিএসবি কর্তৃক মজুদ নির্ণয়	জিএসবি কর্তৃক নির্ণয়কৃত মজুদের মূল্য-কোটি টাকা (১৩০ ইউএসডি/টন ধরে)	পরবর্তীতে কোম্পানী মজুদ নির্ণয়	কোম্পানী কর্তৃক নির্ণয়কৃত মজুদের মূল্য-কোটি টাকা (১৩০ ইউএসডি/টন ধরে) ১ ইউএসডি=৯০টাকা ধরে
জামালগঞ্জ	জয়পুরহাট	১১.৫	৬৪০-১১৫৮	০.৬	১১০০০	১০৫৩	১২৩২০১০	৫৭৩৮	৬২৭৪২৬১
বড়পুকুরিয়া	দিনাজপুর	৬.৬৮	১১৮-৫০৯	০.৫৩	১১০৪০	৩০০	৪৫১৭৮২	৩৯০	৪২২৫০০
খালাসপীর	রংপুর	৭.৫	২২২-৫১৬	০.৭৭	১২৭০০	১৪৩	১৬৪০২৯	৫২৩	৫৬১৩৮৫
দিঘীপাড়া	দিনাজপুর	২৪	৩২৮-৪৫৫	১.১৪	১৩০৯০	১৫০	১৭০৩৮৮	৬০০	৬৩৮১৮১
মোট মজুদ ১৬৪৬ মি.ট.							মোট ২০১৮২০৯ কোটি টাকা	মোট মজুদ ৭২৫১ মি.ট.	মোট ৭৮৯৬৩২৮ কোটি টাকা

** জামালগঞ্জের আপডেট রিজার্ভ ৫৪৫০ মিলিয়ন টন

টেবিল ১০: বিগত ৫ বছরের কয়লা উৎপাদন ও আমদানি চিত্র

বছর	দেশীয় উৎপাদন	আমদানি	মোট
২০১৬-১৭	১,১৬০,৬৫৮	২,৮০১,৪০৭	৩,৯৬২,০৬৫
২০১৭-১৮	৯২৩,২৭৬	৩,৩৯৪,৫৩৪	৪,৩১৭,৮১০
২০১৮-১৯	৮০৩,৩১৫	৫,৭৫৪,০২৫	৬,৫৫৭,৩৩৯
২০১৯-২০	৮০৮,৩৫৮	৬,৮২৮,০৩২	৭,৬৩৬,৩৯০
২০২০-২১	৭৫৩,৯৭৩	৬,৭৫১,০০০	৭,৫০৪,৯৭৩

চিত্র ৬: *দেশের কয়লা জোন*

পেট্রোলিয়াম সেক্টর

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সে বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয় সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে (ক) Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No.16 of 1972) এর মাধ্যমে Pakistan National Oil Limited, Dawood Petroleum Limited, Burmah Eastern Limited, Eastern Lubricant Blenders Limited, (খ) Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 27 of 1972) Eastern Refinery Limited এবং (গ) The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-এর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। যুগান্তকারী সে সিদ্ধান্তের সুফল আজও দেশের মানুষ পাচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সারাদেশে সরকার নির্ধারিত একই মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয় করছে। দেশব্যাপী জ্বালানি তেলের সুসংগঠিত সরবরাহ, মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থার কারণে দেশে কখনো জ্বালানি তেলের

সংকট পরিলক্ষিত হয়নি বা ঘাটতির কারণে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। ঐতিহ্য, গৌরব ও সাফল্যের ৫৪ বছরের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের শতভাগ মালিকানাধীন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি তেল পরিশোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে গুণগত মানসম্পন্ন জ্বালানি তেল উৎপাদন করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বিপিসির সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে এসে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড তাদের বার্ষিক পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে.টন ক্রুড অয়েল পরিশোধন) অর্জনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) হ'ল পেট্রোলিয়াম খাতের নোডাল সংস্থা যা অপরিশোধিত তেল ও পণ্য আমদানি, তেল পরিশোধন ও পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের বিষয়ে কাজ করে। বিপিসির আওতাধীন চট্টগ্রামের অবস্থিত ইস্টার্ন রিফাইনারী লিঃ দেশের একমাত্র অপরিশোধিত তেল পরিশোধন সংস্থা এবং তিনটি তেল বিপণন সংস্থা পদ্মা অয়েল, মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও যমুনা অয়েল সারাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন করে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম খাতে সরকারী একচেটিয়া থাকলেও বর্তমানে বেসরকারী খাত এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে।

দেশের জ্বালানি চাহিদার প্রায় ২২% আমদানিকৃত তেল দ্বারা পূরণ করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয় রিফাইন্ড অয়েল। এছাড়া ক্রুড অয়েল ও ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হয়। ফার্নেস অয়েল সরকারিভাবে ছাড়াও বেসরকারিভাবে আমদানি করা হয়। তেল ছাড়াও দেশে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) আমদানি করা হয়, যা ৯৮% বেসরকারিভাবে করা হয়। বিপিসি একমাত্র পেট্রোলিয়াম পণ্য হিসেবে ন্যাপথা রপ্তানি করে।

টেবিল ১১: একনজরে দেশের পেট্রোলিয়াম সেক্টর

Product	২০২০-২১ (in Ton)
রিফাইন্ড অয়েল আমদানি	৪,৩৪৪,৯৫৯
ফার্নেস অয়েল আমদানি	২,৬৯৪,৯৬৯
ক্রুড অয়েল আমদানি	১,৩০৭,২৬২
উৎপাদিত কনডেনসেট	৪৫৭,৯৮০
মোট	৮,৮০৪,৮৭০
ন্যাপথা রপ্তানি	০
বিপিসি এর স্টোরেজ ক্ষমতা	১,৩২৮,০০০
ERL এর রিফাইন ক্ষমতা	১,৫০০,০০০
ERL কর্তৃক LPG উৎপাদন	১২,৪০৬
Kailashtila Frac. Plant কর্তৃক LPG উৎপাদন	১০৫৫
LPG আমদানি (প্রাইভেট)	১,৪২৭,৮২৬

পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যবলী:

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ (জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত): বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীনে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯৯০.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ হলো হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা; হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজে আধুনিক ও নিরাপদে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে হাইড্রেন্ট সিস্টেম প্রকল্প; কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি)'তে ৩X২৫০০ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জেট ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাংক; ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেডে ৩X১৩,০০০ মেঃটন ষ্টোরেজ ট্যাংক; তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ৩X১০,০০০ মেঃটন ষ্টোরেজ ট্যাংক; সিরাজগঞ্জে অবস্থিত বাঘাবাড়ী ডিপোতে ৩X১০,০০০ মেঃটন ষ্টোরেজ ট্যাংক; কনস্ট্রাকশন অব এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (ফ্লোটিং রুফ) এ্যাট ইআরএল এবং ১X৮,০০০ মেঃটন ও ২X৭,০০০ মেঃটন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট গোদনাইল/ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ডিপো প্রকল্প। এছাড়া, সহজ ও নিখুঁতভাবে ট্যাংকে রক্ষিত জ্বালানি তেল পরিমাপের জন্য তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম চালু করা হয়। "ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২" বাস্তবায়নের জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। "কন্সট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইন্সটলেশন" প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ মেঃটন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯ লক্ষ

মেঃটন হতে বিগত ১২ বছরে সারাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৪ লক্ষ ৩১ হাজার মেঃটন বৃদ্ধি করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩.২০ লক্ষ মেঃটনে উন্নীত করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ: দেশের জ্বালানি তেল পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, দ্রুত, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে-

(ক) আমদানিতব্য পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল জাহাজ হতে খালাসের জন্য "ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাহাজ হতে ১ লক্ষ মেট্রিকটন ক্রুড অয়েল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানিতব্য ৭০ হাজার মেট্রিকটন ডিজেল ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে এবং বাৎসরিক প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে;

(খ) চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল (ডিজেল) গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপোতে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মূল স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার গোদনাইল পর্যন্ত ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ২৩৭ কিলোমিটার, গোদনাইল হতে ফতুল্লা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.২৯ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে;

(গ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২২ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে;

(ঘ) ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship Pipeline (IBFPL)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে; এবং

(ঙ) ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড হতে পরিশোধিত তেল বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় সরবরাহের ব্যবস্থা নির্ভুল ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে "ইন্সটলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সালে সমাপ্ত হবে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ: দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব ও মানসম্পন্ন জ্বালানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ-

(ক) দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এর পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে "ইআরএল ইউনিট-২" নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঠিকাদার (EPC) নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;

(খ) দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করার মাধ্যমে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য পেট্রোক্যামিকেল পণ্য উৎপাদনের জন্য "পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোক্যামিকেল রিফাইনারী উইথ এসিপএম" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(গ) "পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এ্যাট মহেশখালী, কক্সবাজার" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে;
(ঘ) তেল বিপণন কোম্পানির প্রধান স্থাপনাসহ সকল ডিপোতে জ্বালানি তেল গ্রহণ, পরিমাপ, সরবরাহ ও বিতরণসহ সার্বিক কার্যাদি অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে;

(ঙ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে প্রায় ৪০,০০০ মেট্রিকটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ টার্মিনাল নির্মিত হলে ভোক্তা পর্যায়ে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি সরবরাহ করা সম্ভব হবে;

(চ) সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুরে ১ লক্ষ মেট্রিকটন এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

(ছ) মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রাহক পর্যায়ে সঠিক পরিমাপে মানসম্পন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মোট ৬টি বিশ্বমানের মডেল ফিলিং স্টেশন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনটি বিপণন কোম্পানির ০৩(তিন) টি মডেল ফিলিং স্টেশন নির্মান কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি ফিলিং স্টেশন নির্মানের কার্যক্রম শীঘ্রই সম্পন্ন হবে ।

কনডেনসেট

কনডেনসেট (Condensate) বর্ণহীন অথবা ঈষৎ হলুদ বর্ণের তরল হাইড্রোকার্বন। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকালে ভূগর্ভ থেকে গ্যাসের সঙ্গে কনডেনসেট বেরিয়ে আসে। বেশিরভাগ কনডেনসেটই হাল্কা গ্যাসোলিন পরিসরে (বিউটেন, পেন্টেন ও হেক্সেন) বিদ্যমান সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশে খনিতে তেল পাওয়া যায়না, তবে ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে যথাঃ বিবিয়ানা, জালালাবাদ, কৈলাসটিলা, বিয়ানীবাজার, হরিপুর এবং রশিদপুরে (সুরমা বেসিন ভিত্তিক) উচ্চমাত্রায় কনডেনসেট রয়েছে। এ সকল গ্যাসক্ষেত্র হতে আহরিত কনডেনসেট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৩টি ফ্রাকশনেটিং প্লান্টে ফ্রাকশনেট করে অক্টেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হয় । এছাড়া রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেটিং প্লান্টের মাধ্যমেও কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করা হয় যার ক্যাপাসিটি ৩৭৫০ ব্যারেল/দিন।

টেবিল ১২: বিগত ৫ বছরের কনডেনসেট উৎপাদন চিত্র

বছর	SGFL, BGFCL & BAPEX (bbl)	IOC (bbl)	মোট (bbl)
২০১৬-১৭	৫৩২,১০৩.২৪	৩,৮১৮,৮৮৬.৮০	৪,৩৫০,৯৮৯.৯০
২০১৭-১৮	৫১৪,০৪৬.১৪	৩,৮০৫,২৪৫.১৩	৪,৩১৯,২৯১.২৬
২০১৮-১৯	৪৭৬,৩১০.৬৭	৩,৬৪১,৫৬৯.২৬	৪,১১৭,৮৭৯.৯৩
২০১৯-২০	৪৫৩,৮৬৩.৩৫	৩,৩৮৪,০০৯.৫৯	৩,৮৩৭,৮৭২.৯৪
২০২০-২১	৪১১,৬১৫.০০	২,৯৪৬,০১৩.০০	৩,৩৫৭,৬২৮.০০

গ্যাসের মজুদ কমে আসার সাথে সাথে গত কয়েক বছরে দেশীয় কনডেনসেট এর মোট উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশে নতুন আর কোন ফ্রাকশনেটিং প্লান্ট স্থাপনের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া দেশীয় ফ্রাকশনেটিং প্লান্ট হতে যে তেল পাওয়া যায় তা উন্নতমানের নয়; এগুলোর মান নিম্ন গ্রেডের। আমদানিকৃত তেলের তুলনায় নিম্ন গ্রেডের হলেও এই তেল একই মূল্যে বাজারজাত করা হয়। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ব্যবহার করে এই তেলের মান উন্নত করা গেলেও তা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয়না। আমদানিকৃত তেলের সাথে একই মূল্যে বাজারজাত করায় দেশীয় ফ্রাকশনেটিং প্লান্ট হতে উৎপাদিত তেলের ব্যবহার নিয়ে ACC ইতোমধ্যে অভিযোগ জানিয়েছে। যদিও এ অভিযোগ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ী দেশীয় পণ্য সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতি সরকার যে উৎসাহ প্রদান করে, তার অন্তরায়।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

হিমালয় পর্বতমালা বিধৌত পলি দ্বারা মূলত বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সৃষ্টি। দেশের উত্তর - পশ্চিমাংশে মূলত রংপুর, রাজশাহী বিভাগ এলাকায় এই পলিমাটির স্তরের পুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এই এলাকায় বেইজমেন্ট রকের আদি আগ্নেয় শিলার স্তরের গভীরতা খুব বেশী নয়। এর মধ্যে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া এলাকায় সর্বনিম্ন গভীরতায় এই বেইজমেন্ট রক থেকে গ্রানাইট পাথর বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে। দেশের উত্তর - পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া অন্য অংশের এই বেইজমেন্ট রক ধাপে ধাপে অনেক নিচে নেমে গেছে। ফলে এর উপরে বিপুল পরিমাণ কাঁদা এবং বালু মিশ্রিত পাললিক শিলা জমা হয়েছে। খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক মজুদের ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্ত বিবেচনায় উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলকে একটি অঞ্চল এবং অবশিষ্ট এলাকাকে আরেকটি অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলার সম্ভাব্যতা রয়েছে। কিন্তু তেল, গ্যাস মজুদের কোন সম্ভাবনা না থাকায় অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা নেই। অন্যদিকে অবশিষ্ট এলাকায় তেল, গ্যাসের মজুদের সম্ভাব্যতা থাকায় অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

কঠিন খনিজ হিসেবে বা অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে কিছু খনিজ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আহরণ করা হচ্ছে এবং কিছু খনিজ ভূ-অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়েছে। এই উভয় প্রকার খনিজ সংগ্রহে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত/দিকনির্দেশনা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

Peat (পিট)

পিট কয়লার প্রাথমিক পর্যায় বা জাত। জলাভূমি ও আর্দ্র স্থানে বেড়ে ওঠা গাছপালা, গুল্মলতা, শ্যাওলা-শৈবালের আংশিক পচন ও বিসরণের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি গাঢ় বাদামি বা কৃষ্ণকায় অবশেষ। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন বিশিষ্ট বদ্ধ পানিতে উদ্ভিদাদির পচনের ফলে এটি গঠিত হয়। পিটে আর্দ্রতামূলক উপাদান ৭৫ শতাংশের বেশি, কার্বন ৬০% ও অক্সিজেন ৩০% (আদ্রতামুক্ত অবস্থায়)। শুষ্ক অবস্থায় এটি অবাধে জ্বলে। এতে শনাক্তযোগ্য উদ্ভিজ্জ কণিকা বিদ্যমান থাকলেও মণিক নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পিট মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে মাদারীপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনা জেলার কোলা মৌজা, মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার ও চাতাল বিল এবং সুনামগঞ্জ জেলার পাগলা ও চোরকাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

টেবিল ১৩: দেশে পিট এর অবস্থান ও মজুদ

প্রাপ্তিস্থান এলাকা	ধারণাকৃত মজুদ (মিলিয়ন টন)	জেলা
বাঘিয়া ও চান্দা বিল	১৫০	গোপালগঞ্জ
কোলা মৌজা	৮	খুলনা
হাকালুকি হাওর	২৮২	মৌলভীবাজার
শাল্লা ও দিরাই	১২৭	সুনামগঞ্জ
বিজয়নগর	৩২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাংলাদেশে প্রাপ্ত পিট বাদামি থেকে ঘন বাদামি রঙের এবং নরম আঁশময়। এটি শুকালে সংকুচিত, দৃঢ় ও ভঙ্গুর হয়। এর Heating Value কম এবং আদ্রতা বেশি হওয়ায় জ্বালানি হিসেবে দেশে এর গুরুত্ব কম। বাংলাদেশে পিট ক্ষেত্রগুলো ভূ-পৃষ্ঠে বা এর খুব কাছে বিদ্যমান। ফলে পিট সংগ্রহের সাথে বসতবাড়ি, চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। পিট সংগ্রহ অদ্যাবধি বানিজ্যিকভাবে লাভবান বিবেচিত হয়নি । তাছাড়া দেশে বিকল্প জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতেও এটি জ্বালানি হিসেবে বানিজ্যিক ভাবে সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই । কাজেই এটি আর খনিজ সম্পদের পর্যায়ভুক্ত নেই বললেই চলে।

Limestone (চুনাপাথর)

চুনাপাথর মূলত খনিজ ক্যালসাইট আকারে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO3$) দ্বারা রচিত একটি পলল শিলা। এটি সাধারণভাবে পরিষ্কার, উষ্ণ, অগভীর সামুদ্রিক জলে গঠিত হয়। এটি সাধারণত একটি জৈব পলল শিলা যা খোল, প্রবাল, অ্যালগাল এবং মল জমে গঠন লাভ করে। এটি হ্রদ বা সমুদ্রের জল থেকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধ:ক্ষেপন দ্বারা গঠিত রাসায়নিক পললও হতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চুনাপাথর মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

টেবিল ১৪: দেশে চুনাপাথর এর অবস্থান ও মজুদ

প্রাপ্তিস্থান এলাকা	ধারণাকৃত মজুদ (মিলিয়ন টন)	জেলা
তাজপুর, বদলগাছি	২৫০০০+	নওগাঁ
জয়পুরহাট	১০০	জয়পুরহাট
পাঁচবিবি	৫০+	জয়পুরহাট
বাগালি বাজার	১৭	সুনামগঞ্জ
টাকেরঘাট	১২.৯	সুনামগঞ্জ
লালঘাট	১২.৯	সুনামগঞ্জ

চুনাপাথর তৈরি পরিবেশ: সামুদ্রিক

বেশিরভাগ চুনাপাথর অগভীর, শান্ত, উষ্ণ সামুদ্রিক জলে তৈরি হয়। এই জাতীয় পরিবেশ হ'ল যেখানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট খোল এবং কঙ্কাল গঠনে সক্ষম জীবগুলি সমুদ্রের জল থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সহজেই বের করতে পারে। যখন এই প্রাণীগুলি মারা যায়, তখন তাদের খোল এবং কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ একটি পলি হিসাবে জমা হয় যা চুনাপাথরে লাভ করতে পারে। এই ধরণের পলল থেকে তৈরি চুনাপাথরগুলি জৈবিক পলল। তাদের জৈবিক উৎস প্রায়শই শিলায় জীবাশ্মের উপস্থিতি দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিছু চুনাপাথর সামুদ্রিক বা টাটকা জল থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সরাসরি অধ:ক্ষেপন দ্বারা গঠন করতে পারে। এইভাবে গঠিত চুনাপাথরগুলি হ'ল রাসায়নিক পাললিক শিলা। তারা জৈব চুনাপাথরের চেয়ে পরিমানে কম বলে মনে করা হয়। আজ পৃথিবীতে অনেকগুলি চুনাপাথর তৈরির পরিবেশ রয়েছে। এদের বেশিরভাগটি 30 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 30 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অগভীর জলের অঞ্চলে পাওয়া যায়। ক্যারিবীয় সাগর, ভারত মহাসাগর, পারস্য উপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপের চারপাশে এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে চুনাপাথর তৈরি হচ্ছে।

চুনাপাথর তৈরি পরিবেশ: বাষ্পীয়

বাষ্পীভবনের মাধ্যমেও চুনাপাথর গঠন করতে পারে। স্ট্যালাকটাইটস, স্ট্যালাগমাইটস এবং অন্যান্য গুহা গঠন বাষ্পীভবনের মধ্য দিয়ে গঠিত চুনাপাথরের উদাহরণ। একটি গুহায়, উপরে থেকে নিচে বয়ে যাওয়া ফোটা ফোটা পানি গুহার সিলিংয়ের ফ্র্যাকচার বা অন্যান্য ছিদ্র স্থানগুলির মধ্য দিয়ে গুহায় প্রবেশ করে। সেখানে তারা গুহার তলায় পড়ার আগে বাষ্পীভবন হতে পারে। জল বাষ্পীভূত হয়ে গেলে, কোনও ক্যালসিয়াম কার্বনেট যা পানিতে দ্রবীভূত হয়েছিল তা গুহার সিলিংয়ে জমা হবে। সময়ের সাথে সাথে, এই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটি গুহার ছাদে আইসিকেল-আকারের ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা করতে পারে। এই জমাগুলি স্ট্যালাকটাইট হিসাবে পরিচিত। যদি ফোটা মেঝেতে পড়ে বাষ্পীভবন হয় তবে একটি স্ট্যালাগামাইট গুহার তল থেকে উপরের দিকে বাড়তে পারে।

চুনাপাথরের রাসায়নিক গঠন

চুনাপাথর সংজ্ঞানুসারে একটি শিলা যা ওজন অনুসারে ক্যালসাইট আকারে কমপক্ষে 50% ক্যালসিয়াম কার্বনেট ধারণ করে। সমস্ত চুনাপাথরে কমপক্ষে কয়েক শতাংশ অন্যান্য উপকরণ থাকে। এগুলি কোয়ার্টজ, ফেল্ডস্পার, কাদামাটির খনিজ পদার্থ, পাইরাইট, সিডারাইট এবং অন্যান্য খনিজগুলির ছোট ছোট কণা হতে পারে। এটি চার্ট, পাইরাইট বা সিডারাইটের বৃহৎ নুড়ি ধারণ করতে পারে।

চুনাপাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটিকে এমন একটি বৈশিষ্ট দেয় যা প্রায়শই শিলা সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় - এটি 5% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের একটি শীতল দ্রবনের সংস্পর্শে বুদবুদ সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন ধরণের চুনাপাথর

চুনাপাথরের জন্য বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়। এই নামগুলি কীভাবে শিলাটি তৈরি হয়েছিল, এর উপস্থিতি বা এর গঠন এবং অন্যান্য কারণগুলির উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে।

চক: খুব সূক্ষ্ম পৃষ্ঠতলযুক্ত একটি নরম চুনাপাথর যা সাধারণত সাদা বা হালকা ধূসর বর্ণের হয়। এটি মূলত আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক জীব যেমন ফোরামিনিফারগুলির ক্যালকেরিয়াস খোল বা বহু ধরণের সামুদ্রিক শৈবাল অবশেষ থেকে তৈরি হয়।

কোকুইনা: একটি দুর্বল সংযুক্তির চুনাপাথর যা মূলত ভাঙা খোলের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত। এটি প্রায়শই সমুদ্র সৈকতে তৈরি হয় যেখানে তরঙ্গ ক্রিয়া একই আকারের খোরলর টুকরা পৃথক করে।

জীবাশ্ম চুনাপাথর: একটি চুনাপাথর যা সুস্পষ্ট এবং প্রচুর জীবাশ্ম ধারণ করে। সাধারণত এগুলি চুনাপাথর তৈরি করে এমন জীবের খোল এবং কঙ্কালের জীবাশ্ম।

লিথোগ্রাফিক চুনাপাথর: একটি খুব ঘন চুনাপাথর যা খুব মসৃন এবং অভিন্ন দানা দ্বারা গঠিত। এটি পাতলা আকারে বেড গঠন করে যার পৃষ্ঠ খুব মসৃণ ও সহজেই পৃথক হয়। 1700 দশকের শেষের দিকে, একটি মুদ্রণ প্রক্রিয়া (লিথোগ্রাফি) তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ওলাইটিক চুনাপাথর: একটি চুনাপাথর প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট "ওলাইটস" দ্বারা গঠিত, একটি ছোট গোলক যা বালি কণা বা খোলের খন্ডে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ঘন ঘন আস্তরন দ্বারা গঠিত।

ট্র্যাভারটাইন: একটি চুনাপাথর যা বাষ্পীভবন অধ:ক্ষেপন দ্বারা গঠিত হয়, প্রায়শই একটি গুহায় স্ট্যালাকটাইটস, স্ট্যাল্যাগমাইটস এবং ফ্লোস্টোনের মতো কাঠামো তৈরি করতে।

তুফা: একটি গরম প্রস্রবণ, হ্রদের তীরে বা অন্য জায়গায় ক্যালসিয়ামযুক্ত জলের অধ:ক্ষেপন দ্বারা উৎপাদিত একটি চুনাপাথর।

চুনাপাথরের ব্যবহার

চুনাপাথরের বিচিত্র ব্যবহার। এটি এমন এক শিলা যা অন্য কোনও শিলার চেয়ে বেশি উপায়ে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ চুনাপাথর চূর্ণ পাথর তৈরি করে এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি রাস্তার ভিত্ত পাথর এবং রেলপথ নুড়ির জন্য চূর্ণবিচূর্ণ পাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি কংক্রিটের সমষ্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সিমেন্ট তৈরির অন্যতম উপাদান। কিছু ধরণের চুনাপাথর এই ব্যবহারগুলিতে ভাল কারণ এগুলি শক্ত, ঘন শিলা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ঘর্ষণ এবং জমাট/গলানোর বিপক্ষে ভালভাবে দাঁড়াতে সক্ষম করে।

চুনাপাথরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলির মধ্যে রয়েছে:

মাত্রা পাথর: চুনাপাথর প্রায়শই নির্মান এবং আর্কিটেকচারে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার ব্লক এবং স্ল্যাবগুলিতে কাটা হয়। এটি ভবনের সম্মুখ পাথর, মেঝের টাইলস, সিঁড়ির পদস্থান, জানালার ধার এবং অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

ছাদ নির্মান পাথর: সূক্ষ্ম কণা আকারে চূর্ণ, চূর্ণ করা চুনাপাথরটি আবহাওয়া এবং তাপ-প্রতিরোধী হিসাবে ছাদে ব্যবহৃত হয়। এটি ছাদে শীর্ষ আস্তরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ফ্লাক্স স্টোন: চূর্ণ চুনাপাথর ধাতু বিগলন এবং অন্যান্য ধাতব পরিশোধন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়। বিগলনকালে উত্তাপে, চুনাপাথর অমেধ্যের সাথে একত্রিত হয় এবং ধাতুমল হিসাবে প্রক্রিয়া থেকে সরানো যেতে পারে।

পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট: চুনাপাথর একটি ভাটায় শেল, বালি এবং অন্যান্য উপকরণ এবং মাটির সাথে গুঁড়ো আকারে উত্তপ্ত করা হয় যা পানিতে মিশ্রিত হওয়ার পরে শক্ত হয়ে যায়।

কৃষি চুন: ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সর্বাধিক স্বল্পব্যয়ী অ্যাসিড-নিরপেক্ষ এজেন্ট। বালির আকার বা ছোট কণায় চূর্ণ করে চুনাপাথর অম্লীয় মাটির অম্লতা দূরকরণে ব্যবহৃত হয়। এটি বিশ্বজুড়ে খামারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

চুন: ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO3$) যদি ভাটায় উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় তবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ($CO2$) এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) মুক্তি পাবে। ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি শক্তিশালী অ্যাসিড-নিউট্রালাইজেশন এজেন্ট। এটি কৃষিক্ষেত্রে মাটি চিকিৎসা এজেন্ট হিসাবে (কৃষি চুন তুলনায় দ্রুত কার্যকর) এবং রাসায়নিক শিল্পকারখানায় অ্যাসিড-নিউট্রালাইজেশন এজেন্ট হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণি খাদ্য: শক্তিশালী ডিমের খোসা উৎপাদন করতে মুরগির ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রয়োজন, তাই ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রায়শই তাদের কাছে "মুরগির গ্রিটস" আকারে খাদ্য সম্পূরক হিসাবে সরবরাহ করা হয়। এটি কিছু দুগ্ধজাত গবাদি পশুদের খাদ্যে যুক্ত করা হয়েছে যাদের দুধ দেয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম নি:সরণ হয়েছে।

খনি সুরক্ষা ডাস্ট: এটি "রক ডাস্ট" নামেও পরিচিত। পুলভারাইজড চুনাপাথর একটি সাদা পাউডার যা কোনও ভূগর্ভস্থ খনিতে উন্মুক্ত কয়লার উপরিভাগে স্প্রে করা যায়। এই আবরণ আলোকসজ্জার উন্নতি করে এবং কয়লা ধুলার পরিমাণ হ্রাস করে। এটি শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাসকে উন্নত করে এবং এটি বাতাসে জ্বলনযোগ্য কয়লার ধূলিকণা কমিয়ে বিস্ফোরণের ঝুঁকি হ্রাস করে।

চুনাপাথরের আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে। গুঁড়া চুনাপাথর কাগজ, পেইন্ট, রাবার এবং প্লাস্টিকগুলিতে ফিলার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গুঁড়ো চুনাপাথর কয়লার চুল্লিতে শোষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে চুনাপাথর

বাংলাদেশে চুনাপাথরের ভূ-পৃষ্ঠীয় এবং অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠীয় বা ভূগর্ভস্থ উভয় প্রকার মজুত রয়েছে। কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনস দ্বীপ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙ্গোরঘাট-লালঘাট-টাকেরঘাট এলাকায় চুনাপাথরের ভূ-পৃষ্ঠীয় ও ভূ-পৃষ্ঠের স্বল্পগভীরতায় মজুত রয়েছে। জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাটে রয়েছে চুনাপাথরের অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠীয় বা ভূগর্ভস্থ মজুত। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিরাজমান চুনাপাথর প্লাইসটোসিন সময়কালের এবং উপরে উল্লিখিত অন্যান্য স্থানের মজুতগুলি ইয়োসিন যুগীয়। সীতাকুন্ডের ভূ-পৃষ্ঠীয় চুনাপাথর নবীন মায়োসিন যুগীয় বলে ধারণা করা হয়।

চুনাপাথর, সীতাকুন্ড

বাংলাদেশে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম চুনাপাথরের মজুত আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে, পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বা জি.এস.পি (বর্তমানে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বা জি.এস.বি) ১৯৫৮ সালে এ মজুত এলাকায় জরিপ কার্য পরিচালনা করে এবং প্রায় ০.০৬ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে ১.৮ মিলিয়ন টন ঝিনুক খোলস ও প্রবালসমৃদ্ধ চুনাপাথরের মজুত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। তবে আবিষ্কৃত এ চুনাপাথর উন্নত মানের নয়। সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাটে ১৯৫১ ও ১৯৫৭ সালের মধ্যে চুনাপাথরের কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মজুত পাওয়াদ যায়। জি.এস.পি এ সকল মজুতের বিস্তৃতি অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬১ সালে টাকেরঘাট এলাকায় খননকার্য পরিচালনা করে এবং ৬৬টি কূপ খননের মাধ্যমে জেলার বাগালিবাজার-টাকেরঘাট-ভাঙ্গোরঘাট এলকায় চুনাপাথরের বিস্তৃতি খুঁজে পায়।

বাগালিবাজারে খনির অবস্থান ভূ-পৃষ্ঠের ৩০ থেকে ১০০ মিটার গভীরে। খনির গড় পুরুত্ব ১৫২.২ মিটার এবং প্রায় ০.৭৭ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত খনিতে ১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন চুনাপাথর মজুত রয়েছে। লালঘাটে ভূ-পৃষ্ঠের ৬ থেকে ১০ মিটার গভীরতায় রয়েছে চুনাপাথরের অবস্থান। খনির পুরুত্ব ২২ মিটার থেকে ৭৬ মিটার পর্যন্ত এবং প্রায় ০.২৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত খনিতে চুনাপাথরের মজুত ৯.৮ মিলিয়ন টন। টাকেরঘাটে ভূ-পৃষ্ঠের ৭ মিটার থেকে ৫৭ মিটার গভীরতায় চুনাপাথর খনি অবস্থিত। এ খনির পুরুত্ব ২.৮ মিটার থেকে ৪৪ মিটার পর্যন্ত যার বিস্তৃতি প্রায় ০.০৪২ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী। টাকেরঘাটের খনিতে চুনাপাথরের অনুমিত মজুত ২.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভাঙ্গোরঘাটে ভূ-পৃষ্ঠের ২৯ মিটার গভীরে চুনাপাথর পাওয়া গিয়েছে। প্রায় ০.০১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এবং ২১ মিটার থেকে ৩৭ মিটার পুরুত্ববিশিষ্ট এ চুনাপাথর খনিতে মজুতের পরিমাণ ১ মিলিয়ন টন। ১৯৮২ সালে জিএসবি বাগালীবাজারে আরও ৫টি কূপ খনন করে এবং এ কূপসমূহের ওপর ভিত্তি করে ভূ-পৃষ্ঠের স্বল্প গভীরতায় চুনাপাথরের আরও মজুত প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে চুনাপাথর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। এ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে ছাতকে অবস্থিত ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে সরবরাহের জন্য ভারতের মেঘালয় রাজ্য থেকে চুনাপাথর আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন টাকেরঘাটের চুনাপাথর খনি থেকে চুনাপাথর উৎপাদন করে তা ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সরবরাহ করা শুরু করে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ খনি থেকে প্রায় ০.৬১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন চুনাপাথর উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে টাকেরঘাটের মজুত প্রায় শূন্যের কোঠায়, নতুন মজুত আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ছাড়াও সিলেটের ডাউকি নদী এলাকায় চুনাপাথরের একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় রয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক আহরণের দরুন এ সঞ্চয়ও বর্তমানে প্রায় নিঃশেষিত হওয়ার পথে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ভূগর্ভস্থ চুনাপাথরের সঞ্চয় আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৯ সালে। আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি বগুড়া জেলার কুচমাতে তেল অনুসন্ধান কূপ খননকালে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৯৬৭ মিটার নিচে সর্বপ্রথম এ চুনাপাথর স্তরের সন্ধান পায়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে জিএসপি ইউ.এন-পাক (UN-PAK) মিনারেল সার্ভে প্রকল্পের অধীনে এ এলাকায় বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থগত জরিপকার্য পরিচালনা করে ইয়োসিন সময়ের চুনাপাথর স্তর আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এতদঞ্চলে কূপ খনন করা হলে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ৩৩০ মিটার গভীরতায়, জয়পুরহাট জেলার পাহাড়পুরে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ৪৯৫ মিটার গভীরতায় এবং জয়পুরহাট-জামালগঞ্জ এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের নিচে ৫১৭ মিটার থেকে ৫৪৮ মিটার গভীরতায় চুনাপাথরের স্তর প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

যায়। ১৯৬৬ সালে জার্মানির ফ্রাইড ক্রুপ রোসটফ (Fried Krupp Roshtoff) নামক খনি পরামর্শক কোম্পানি খনি থেকে চুনাপাথর উত্তোলনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করে এবং তারা তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে জয়পুরহাটে একটি ভূগর্ভস্থ চুনাপাথর খনি ও তার সঙ্গে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে বলে মত প্রকাশ করে। এ মতামতকে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যের পাওয়েল ডফরিন টেকনিক্যাল সার্ভিসেস (Powell Doffryn Technical Services) পরামর্শক দলকে নিয়োগ করা হলে তারাও এ ব্যাপারে একই রকম মত প্রকাশ করে। দু'দফায় ইতিবাচক মতামত পাওয়ার পর ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার ব্যয়সাধ্য বরফীকরণ পদ্ধতিতে খাড়া খনন শ্যাফট তৈরি করার মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে চুনাপাথর উত্তোলনের প্রকল্প অনুমোদন করে। জিএসবি ১৯৭৮ সালে প্রস্তাবিত খনি এলাকায় দুটি কূপ খনন করে ৬.৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ২৭০ মিলিয়ন টন চুনাপাথর রয়েছে বলে হিসাব করতে সমর্থ হয় যার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুত ১০০ মিলিয়ন টন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের সিমেন্টেশন মাইনিং লিমিটেড (Cementation Mining Ltd) নামক সংস্থা খনি এলাকার ভূগর্ভস্থ তাপমাত্রা হিসাব করে এ মর্মে মত প্রকাশ করে যে, এ তাপমাত্রা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাভাবিক গভীরতা নতিমাত্রা তাপমাত্রার (general depth gradient temperature) তুলনায় সামান্য বেশি যার ফলে খনি শ্যাফট নির্মাণে বরফীকরণ পদ্ধতির ব্যয় অনুমিত ব্যয়ের তুলনায় অধিক হবে এবং খনিটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না। এ প্রতিষ্ঠানের মতামত পাওয়ার পর জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। জিএসবি তুলনামূলক কম গভীরতা থেকে চুনাপাথর পাওয়ার আশায় ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে পুনরায় দুটি কূপ খনন করে, তবে এ প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

মজুদ বিবেচনায় একমাত্র জয়পুরহাট খনিটি উত্তোলনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। খনি এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠে অরক্ষিত থাকা চুনাপাথর স্থানীয়ভাবে জণগণ সংগ্রহ করে থাকে। জিএসবি জয়পুরহাটে দুটি কূপ খনন করে চুনাপাথর উত্তোলনের প্রকল্প গ্রহণ করে কিন্তু এ খনির গভীরতা অত্যধিক হওয়ায় (প্রায় ১৬০০-১৭০০ ফুট) এবং খনির ভিতরে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্ন্তভূপৃষ্ঠীয় চুনাপাথর উত্তোলনে প্রকল্প ব্যয় অত্যধিক এবং ভূ-পৃষ্ঠীয় চুনাপাথর উত্তোলনে চাষের জমি, বসত বাড়ির সাথে অন্যান্য পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া পাশ্ববর্তী দেশ ভারত হতে সেদেশের ভূ-পৃষ্ঠীয় থেকে আহরিত চুনাপাথর সহজে আমদানির সুযোগ রয়েছে। সেজন্য এ দেশের অর্ন্তভূপৃষ্ঠীয় অবস্থিত চুনাপাথর আহরণ করা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে না বিধায় চুনাপাথর উত্তোলনের কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।

White Clay (চীনামাটি)

চীনামাটি (White Clay or China Clay) কেওলিন কর্দম মণিক দ্বারা গঠিত উন্নতমানের কর্দম; প্রধানত সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গৃহস্থালি সামগ্রী হিসেবে চীনামাটির তৈরী তৈজসপত্রের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূ-পৃষ্ঠে অথবা অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠে (subsurface) চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর ও গোপালপুরে, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায়, চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাঁও ও সাতকানিয়া উপজেলার বাইতুল ইজ্জতে চীনামাটির মজুত রয়েছে। এ ছাড়া দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া, বড়পুকুরিয়া ও দীঘিপাড়া এবং নওগাঁ জেলার পত্নীতলাতে ভূ-পৃষ্ঠের নিকটে চীনামাটি মজুতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে প্রাপ্ত চীনামাটির গুণগত মান উন্নত নয়। এ চীনামাটির সঙ্গে আমদানিকৃত উচ্চ মানসম্পন্ন কর্দম মিশিয়ে তা দেশের সিরামিক শিল্প কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জি.এস.পি, বর্তমান বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর- জি.এস.বি) ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত (দুর্গাপুর বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা) ভেদিকুরা নামক স্থানে প্রথম চীনামাটির সন্ধান লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে সে অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রাঙ্কণ সম্পন্ন হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে জিএসপি অত্র এলাকায় ১৩টি কূপ খননের মাধ্যমে চীনামাটি মজুতের গভীরতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭৮, ১৯৮০ এবং ১৯৮৩ সালে জি.এস.বি এ এলাকায় ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, পশ্চিমে ভেদিকুরা থেকে মাইজপারা এবং পূর্বে ফুন্ডাকুরা থেকে গোপালপুর পর্যন্ত চীনামাটির স্তর বিস্তৃত রয়েছে। প্রায় ৩.৮৪ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬০ মিটার গভীরতায় অবস্থিত এ চীনামাটির মজুতের পরিমাণ ২.৪৭ মিলিয়ন টন বলে পরিমাপ করা হয়। এ চীনামাটিকে বিজয়পুর চীনামাটি হিসেবে নামকরণ করা হয়।

জি.এস.বি ১৯৯০ সালে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার ভূরাঙ্গা এলাকায় চীনামাটির মজুত আবিষ্কার করে। প্রায় ০.৪০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত চীনামাটি ক্ষেত্রটিতে মজুতের পরিমাণ ০.০০১৩ মিলিয়ন টন। এর পূর্বে জি.এস.বি ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার অন্তর্গত হাইটগাঁও এলাকায় চীনামাটির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মজুত আবিষ্কার করে। এ সকল মজুতের মোট পরিমাণ ০.০০১৯ মিলিয়ন টন মাত্র। একই জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাইতুল ইজ্জত এলাকায় আবিষ্কৃত চীনামাটি মজুতের পরিমাণ ০.০০২৫ মিলিয়ন টন। আবিষ্কৃত এ সকল চীনামাটি তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের।

১৯৬৫ সালে নওগাঁ জেলার পত্নীতলাতে জিএসপি অনুসন্ধান চালানোর সময় সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠের ৩৪০ মিটার থেকে ৩৫০ মিটার গভীরতায় অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠীয় চীনামাটির সন্ধান লাভ করে। মধ্যপাড়া এলাকায় কঠিন শিলা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে খননকার্য চালানোর সময় ১৯৭৪ সালে জি.এস.বি ভূ-পৃষ্ঠের ১২৮ থেকে ১৫৬ মিটার গভীরতায় চীনামাটির সন্ধান পায়। প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের কঠিন শিলার উপরিভাগে এ মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। এ চীনামাটি স্তরের পুরুত্ব ১.২ মিটার থেকে ৬.৪ মিটার পর্যন্ত এবং প্রায় এক বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত এ খনিজের মজুত প্রায় ১৫ মিলিয়ন টন।

১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়াতে কয়লা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে খননকার্য চালানোর সময় জি.এস.বি চীনামাটি আবিষ্কার করে। ভূ-পৃষ্ঠের ১১৮ মিটার থেকে ১৮৪ মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্তরে পার্মিয়ান গন্ডোয়ানা স্তরসমষ্টির উপরে এ চীনামাটি স্তর অবস্থিত। এ স্তরের পুরুত্ব ১.৯৮ মিটার থেকে ১২.৫ মিটার পর্যন্ত এবং প্রায় ১ বর্গ কিমি বিস্তৃত এলাকায় মজুতের পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন টন। একই ভাবে কয়লা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে খননকার্য চালানোর সময় জি.এস.বি ১৯৯৪ সালে দিনাজপুর জেলার দিঘিপাড়ায় চীনামাটির সন্ধান লাভ করে। ভূ-পৃষ্ঠের ৩২৫ থেকে ৩২৮ মিটার গভীরতায় গন্ডোয়ানা স্তরসমষ্টির উপরে এ খনিজের অবস্থান। এটির বিস্তারিত অনুসন্ধানকার্য এখনও সম্পন্ন হয় নি। তবে অন্তর্ভূ-পৃষ্ঠীয় খনি থেকে চীনামাটি উত্তোলন অনেকাংশে ব্যয়বহুল।

টেবিল ১৫: দেশে চীনামাটি এর অবস্থান ও মজুদ

প্রাপ্তিস্থান এলাকা	ধারণাকৃত মজুদ (মিলিয়ন টন)	জেলা
মধুপুর	১২৫০+	টাঙ্গাইল
পাঁচবিবি	১০+	জয়পুরহাট
মাধবপুর	৮৬৮	হবিগঞ্জ
বড়পুকুরিয়া	২৫	দিনাজপুর
বিজয়পুর	২৫	নেত্রকোনা
বাহবল	২	হবিগঞ্জ
মধ্যপাড়া	-	দিনাজপুর
দিঘীপাড়া	-	দিনাজপুর
পত্নীতলা	-	নওগাঁ

ঢাকা , গাজীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সিরামিক কারখানাগুলোয় প্রতিবছর স্থানীয়ভাবে বিপুল পরিমাণ চীনামাটি ব্যবহার করা হয়। অপরিকল্পিত এবং যাচ্ছেতাই ভাবে মাটি আহরণের ফলে চাষের জমি, বসত বাড়ির সাথে অন্যান্য পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং সরকারও বঞ্চিত হয় উপযুক্ত রাজস্ব থেকে। একারনে বি এম ডি কর্তৃক এ কোয়ারীগুলো লীজ দেয়া হতো। পরিবেশবাদী সংগঠনের দায়েরকৃত মামলায় ২০১৬ সাল থেকে এ লীজ প্রদান বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত হতে সেদেশের ভূ-পৃষ্ঠীয় থেকে আহরিত চীনামাটি আমদানি হচ্ছে। লীজ বন্ধ রেখে যদি উত্তোলন বন্ধ না রাখা যায় তাহলে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই পূনরায় আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিশেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে লীজ চালু করা সংগত হবে।

Hardrock (কঠিন শিলা)

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা একমাত্র মজুদ দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় অবস্থিত।

টেবিল ১৬: দেশে কঠিন শিলা এর অবস্থান ও মজুদ

প্রাপ্তিস্থান এলাকা	ধারণকৃত মজুদ (মিলিয়ন টন)	জেলা
মধ্যপাড়া	১১৫ (আহরণযোগ্য)	দিনাজপুর

বিরামপুর	-	দিনাজপুর
মিঠাপুকুর	-	রংপুর
হাকিমপুর	-	দিনাজপুর

বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক ১৯৭৪ সালে ভূ-গর্ভের ১২৮-১৩৬ মিঃ গভীরতায় এই গ্রানাইট পাথরের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে মেসার্স এস এনসি, লিমিটেড কানাডা কর্তৃক ১৯৭৭ সালে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন এবং মেসার্স নিপ্পন কোই, জাপান কর্তৃক আর্থিক ও মার্কেট সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষা সমূহে মধ্যপাড়ায় একটি ভূ-গর্ভস্থ খনি বাস্তবায়ন কারিগরি ও অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক বলে প্রতিয়মান হওয়ায় ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এবং উত্তর কোরীয় সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় মধ্যপাড়া গ্রানাইট পাথর খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং উত্তর কোরীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কোরীয়া সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এর মধ্যে ২৭ মার্চ ১৯৯৪ তারিখে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এর আওতায় একটি টার্ণকী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স নামনাম সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সাল হতে প্রকল্পের কাজ শুরু করে। জুলাই ২০০১ সালের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির সময় নির্ধারিত থাকলেও নামনাম ২৫ মে ২০০৭ সালে খনিটি এমজিএমসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করে। প্রতিদিন তিন শিফটে ৫,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া খনি ডিজাইন করা হয়।

পরবর্তীতে দেশের ক্রমবর্ধনশীল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে গ্রানাইট পাথর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hard Rock Mine" শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এবং জার্মানীয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ৬ বছর মেয়াদী বৈদেশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১,৪০০ কোটি টাকা প্রায়) মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৬ বছরে ১২টি নতুন স্টোপ উন্নয়ন ও ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন করাসহ খনিতে স্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক স্থাপনাসমূহের মডিফিকেশন করে খনিটিকে একটি অত্যাধুনিক স্থাপনা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঠিকাদারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। খনি উন্নয়নের এ চুক্তিটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল । ফলে খনি উন্নয়নের কাংখিত লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি এবং প্রকল্পটি লাভজনক হয়নি। মধ্যপাড়া ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা প্রকল্পটি প্রায় ১.২০ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। শিলার প্রাক্কলিত মজুতের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য মজুত প্রায় ৭৩ মিলিয়ন টন। ২০০৭ সাল থেকে এ খনি থেকে বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হলেও এখনও এটি লাভজনক হয়নি । প্রকল্পটি লাভজনক করার জন্য গ্রানাইট স্লাব উৎপাদন করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা জরিপ করা হয় কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খনি এলাকার গ্রানাইট অসংখ্য ফাটলযুক্ত হওয়ায় গ্রানাইট স্লাব আকারে উত্তোলন সম্ভব নয়। চুক্তি অনুযায়ী পূর্বের ঠিকাদারের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে প্রকল্পটি লাভজনক না হলে এর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে কিনা অথবা কিভাবে চুক্তি করা হলে কিভাবে লাভজনক হবে এবং পেট্রোবাংলার আর্থিক দায়-দায়িত্ব কম হবে তা সুক্ষভাবে যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সংগত হবে। প্রকল্প থেকে পেট্রোবাংলাকে যদি ধারাবাহিকভাবে লোকসান গুনতে হয় সেক্ষেত্রে এ প্রকল্প বন্ধ করা হলে তার ইপপেক্ট কি হতে পারে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে অধিকাংশ কঠিন শিলা আমদানি করা হয়। তাছাড়া কোন নির্মাণ কাজের জন্য খনি থেকে কঠিন শিলা সংগ্রহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ভূ-পৃষ্ঠের মজুদ থেকে কোয়ারি পদ্ধতিতে নির্মাণ কাজের কঠিন শিলা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মাইনিং পদ্ধতিতে কঠিন শিলা সংগ্রহের দৃষ্টান্ত নেই।

Glass Sand (কাঁচবালি)

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্তান (জি.এস.পি) ১৯৬০ সালে শেরপুর জেলার শ্রীবর্দি উপজেলার বালিজুরী এলাকায় সর্বপ্রথম কাচবালি আবিষ্কার করে। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দু'দুবার এ এলাকায় বিস্তারিত অনুসন্ধানকার্য চালানো হয়। বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত ০.১৫ মিটার থেকে ২.১৩ মিটার পুরুত্ববিশিষ্ট ৩০টি অনিয়মিত স্তর বা লেন্সে এ কাচবালি মজুত রয়েছে। প্রায় ০.৫৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত এ মজুতের মোট পরিমাণ ০.৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন (৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন)। জি.এস.পি ১৯৭০-৭১ সালে হবিগঞ্জ জেলার নোয়াপাড়া এলাকায় অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭২-৭৩ সালে এবং ১৯৭৪-৭৬ সালে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জরিপকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এলাকায় ০.১৫ মিটার থেকে ১.৮০ মিটার পুরু কাচবালির সঞ্চয় রয়েছে যার সর্বমোট পরিমাণ ১.৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং এ সঞ্চয়নের বিস্তৃতি ০.৯৮১১ বর্গ কিলোমিটার। ন্যাশনাল মাইনিং ইনস্টিটিউশন ১৯৬৮ সালে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত বাতিসা এলাকায় কাচবালির সন্ধান পায়। জি.এস.পি ১৯৬৮-৭০ সালে এ এলাকায় বিস্তারিত জরিপকার্য পরিচালনা করে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে জি.এস.পি-এর উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ জরিপকার্য অব্যাহত রাখে। এখানে উত্তরে নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণে দত্তেশ্বর নামক স্থান পর্যন্ত ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ০.৫ থেকে ১.৫ কিলোমিটার প্রশস্ত এলাকা বরাবর পর্বত পাদদেশীয় পলির মধ্যে কাচবালির অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে এবং ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি (০.৫ মিটার থেকে ৩.৫ মিটার গভীরতায়) এ বালি পাওয়া যায়। সর্বমোট ৩৪টি লেন্স বা স্তরে সঞ্চিত এ কাচবালির মোট মজুত ০.২৮৫ মিলিয়ন (২ লক্ষ ৮৫ হাজার) মেট্রিক টন।

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার লালঘাট-লামাকাটায় বাংলাদেশ-ভারত (মেঘালয়) সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় ১৯৯১ সালে ভূমি থেকে ২৩.৭৮ মিটার থেকে ৭২.৯৫ মিটার গভীরতায় কাচবালির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ বালি ১.২২ মিটার থেকে ১.৮৩ মিটার পুরুত্ববিশিষ্ট দুটি স্তরে সঞ্চিত রয়েছে। স্তরসমূহের ১৬৪ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মজুতের পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অপর একটি ভূগর্ভস্থ কাচবালির স্তর ১৯৭৪ সালে মধ্যপাড়ায় আবিষ্কৃত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে এর গভীরতা ১২৮ মিটার। এ খনির অবস্থান পুরাজীবীয় ভিত্তিস্তরের উপরে। কর্দম স্তরসহ কাচবালির স্তরের পুরুত্ব ৫.২ মিটার থেকে ১৬ মিটার এবং গড় পুরুত্ব ৪ মিটার। প্রায় ১ বর্গ কিমি এলাকাব্যাপী বিস্তৃত এ কাচবালি সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৭.২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ১৯৮৫ সালে বড়পুকুরিয়াতে কয়লার জন্য খননকার্য পরিচালনার সময় ভূ-পৃষ্ঠের ১১৮ মিটার থেকে ১৮০ মিটার গভীরতায় কাচবালির সন্ধান পাওয়া যায়। এ বালিস্তরের গড় পুরুত্ব ২১.৯০ মিটার এবং মজুত এলাকার বিস্তৃতি ১ বর্গ কিমি যাতে পরিমাপকৃত মজুতের পরিমাণ ৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এ সকল মজুত ছাড়াও দীঘিপাড়ায় ১৯৯৪ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে ভূগর্ভস্থ কাচবালির মজুত। ভূ-পৃষ্ঠের ৬২.১৯ মিটার থেকে ৩২৫.৩০ মিটার গভীরতায় ৫টি স্তরে এ কাচবালি সঞ্চিত রয়েছে। স্তরসমূহের মোট পুরুত্ব ৭৭.১৩ মিটার, তবে মজুতের পরিমাণ এখন পর্যন্ত নির্ণয় করা হয় নি। চৌদ্দগ্রাম-নয়াপাড়া-দত্তেশ্বর এলাকার কাচবালি আহরণ করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রামের ওসমানিয়া গ্লাস শীট কারখানায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে রংপুর প্লাটফর্ম এলাকায় কয়লা অথবা কঠিন শিলা উত্তোলনের কাজ শুরু হলে এ এলাকায় আবিষ্কৃত ভূগর্ভস্থ কাচবালির মজুত থেকে কাচবালি আহরণ করারও সম্ভাবনা রয়েছে।

ভূ-অভ্যন্তরের কাঁচবালি উত্তোলনে প্রকল্প ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় বর্তমানে দেশের কোথাও ভূ-অভ্যন্তরের কাঁচবালি উত্তোলনের কোনো প্রকল্প চলমান নেই। হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কাচবালি সংগ্রহের জন্য ইতোপূর্বে বিএমডি কর্তৃক ইজারা দেয়া হতো। পৃষ্ঠীয় কাচবালি উত্তোলনে চাষের জমি, বসত বাড়ির সাথে অন্যান্য পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ যুক্তিতে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে সিদ্ধাতের প্রেক্ষিতে ২০১৯ সাল থেকে ইজারা প্রদান বন্ধ রয়েছে। তবে বিভিন্ন এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠে অরক্ষিত থাকা কাচবালি জণগণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে থাকে।

Gravel (নুড়িপাথর)

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নুড়িপাথরের মজুত রয়েছে। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে সরাসরি অথবা কংক্রিটের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলিত উপাদান হিসেবে নুড়িপাথর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পঞ্চগড় এলাকায় নুড়িপাথরের মজুদ রয়েছে।

পঞ্চগড় এলাকার নুড়ি ক্ষুদ্র আকারের এবং পরিমানে কম, এ কারনে পরিবেশের বিষয় বিবেচনায় এজারা দেয়া দেয়া হয় না। তবে স্থানীয় জনগণ কূপ পদ্ধতিতে বিক্ষিপ্তভাবে এ নুড়ি সংগ্রহ করছে। বৃহওর সিলেট এলাকার নুড়ি বিভিন্ন স্থানে কোয়ারি হিসেবে পরিবেশের বিষয় বিবেচনা রেখে ইজারা দেয়া হচ্ছে। এই নুড়ি উত্তোলনের ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জেলা প্রশাসকগণ সম্পূর্ণরূপে ইজারা বন্ধের দাবী করে আসছেন কিন্তু বাস্তবতা এই যে, বর্তমানে অনেক এলাকা ইজারা দেয়া না হলেও সেসব স্থান থেকে অবৈধভাবে এবং পরিবেশের ক্ষতির বিষয় কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে এসব নুড়ি উত্তোলন করা হচ্ছে। প্রশাসন নুড়ি উত্তোলন উত্তোলন তথা পরিবেশের ক্ষতি বন্ধ করতে পারছে না। জেলা প্রশাসকগণের দাবী অনুযায়ী চলমান কোয়ারিগুলো ইজারা বন্ধ করা হলে উত্তোলন বন্ধ থাকিবে এমন নিশ্চচয়তা নেই। বরং অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলনের কারণে পরিবেশ আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Heavy Mineral (Beach Sand) ভারি মণিক (সৈকত বালি)

ভারি মণিক সৈকত বালি (Heavy Mineral Beach Sand) বর্তমান বা অতীতের কোন সমুদ্র সৈকত বা কোন উপকূলরেখা বরাবর ভারি মণিকসমূহের মজুদ, যেমন জিরকন, ইলমেনাইট, রুটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশের উপকূলভাগ বরাবর এ পর্যন্ত পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে ১৭টি ভারি মণিক পে-সারের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারি মণিকের সংখ্যা মাত্র ৮টি, যেমন: ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, জিরকন, রুটাইল, গারনেট, লিউককসেন, কায়ানাইট ও মোনাজাইট। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সৈকত বালি ভারি মণিক মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

টেবিল ১৭: দেশে ভারি মণিক সৈকত বালি এর অবস্থান ও মজুদ

প্রাপ্তিস্থান এলাকা	ধারণাকৃত মজুদ (মিলিয়ন টন)	জেলা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত	-	কক্সবাজার
মহেশখালি	-	কক্সবাজার
কুতুবদিয়া	-	কক্সবাজার
কুয়াকাটা	-	পটুয়াখালী

বর্তমানে সৈকত বালি ভারি মণিক আহরণ সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প চালু নেই। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সৈকত বালি আহরণে বিশদ Techno-economic feasibility স্টাডির মাধ্যমে সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এছাড়া ব্রহ্মপুত্র/যমুনা নদীর অববাহিকায় Mineral Sand (River Sand), সুনামগঞ্জের ধূপাজান, ফাজিলপুর, সোনালিছেলা নদীতে Gravel mixed sand এবং রংপুর, দিনাজপুরের মিঠাপুকুর, ছাকুপাড়ায় Metallic Mineral চিহ্নিত করা হলেও এদের কোনোটিরই সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি । এ সংক্রান্ত "Identification and Economic Assessment of the Valuable Minerals in the River Sands of Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নদীবক্ষে সিলিকা বালির উপস্থিতি ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Techno-economic feasibility স্টাডির মাধ্যমে দেশের সকল খনিজ সম্পদের সম্ভাব্যতা আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইলমেনাইট

একটি কালো আয়রন টাইটানিয়াম অক্সাইড খনিজ। টাইটানিয়ামের প্রাথমিক আকরিক, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের উৎস।

চিত্র ৭: ইলমেনাইট

ইলমেনাইট হলো আগ্নেয় শিলা, পলল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পলির শিলাগুলির একটি সাধারণ আনুষঙ্গিক খনিজ। ইলমেনাইট একটি কালো আয়রন-টাইটানিয়াম অক্সাইড যার রাসায়নিক সংকেত $FeTiO3$। ইলমেনাইট হলো টাইটানিয়ামের প্রাথমিক আকরিক, বিভিন্ন ধরণের উচ্চ-ক্ষমতার সংকর প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু। বিশ্বব্যাপী খনন করা বেশিরভাগ ইলমেনাইট টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড ($TiO2$), (একটি গুরুত্বপূর্ণ রঙ্গক, সাদা, এবং ক্ষয়কারী পোলিশ) উৎপাদন করতে ব্যবহৃত হয়।

ভূতাত্ত্বিক ঘটনা

ম্যাগমা চেম্বারগুলির ধীর শীতলকরণের সময় বেশিরভাগ ইলমেনাইট তৈরী হয় এবং ম্যাগমেটিক বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘন হয়। ভূগর্ভস্থ ম্যাগমা চেম্বারটি শীতল হতে কয়েক শতাব্দী সময় নিতে পারে। এটি শীতল হওয়ার সাথে সাথে ইলমেনাইটের স্ফটিকগুলি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গঠিত হতে শুরু করে। এই স্ফটিকগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়ায় ম্যাগমা চেম্বারের নীচে ডুবে যায়। এর ফলে ম্যাগনেট চেম্বারের নীচের অংশে ইলেমেনাইট এবং অনুরূপ-তাপমাত্রার খনিজগুলি যেমন ম্যাগনেটাইট জমা হয়। এই ইলমেনাইট বহনকারী শিলাগুলি প্রায়শই গ্যাব্রো, নরাইট বা অ্যানোরথোসাইট হয়।

ইলমেনাইটের উচ্চ ক্ষয়রোধী ক্ষমতা রয়েছে। যখন ইলমেনাইট যুক্ত শিলাগুলি ক্ষয় হয়, ইলমেনাইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডগুলি অন্যান্য সেডিমেন্ট খন্ডের সাথে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডগুলির উচ্চ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রবাহের সময় তাদের আলাদা করে এবং "ভারী খনিজ বালু (heavy mineral sands)" হিসাবে জমা হয়। এই বালুকণাগুলি কালো রঙের এবং সহজেই ভূতাত্ত্বিকদের দ্বারা চিহ্নিত হয়। "Black sand prospecting" দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত ভারী খনিজ সন্ধান করার একটি পদ্ধতি। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ইলমেনাইট এই বালুকণাগুলির খনন বা ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে করা হয়, যা পরে ভারী খনিজ দানা যেমন ইলমেনাইট, লিউকক্সিন, রুটাইল এবং জিরকন অপসারণের জন্য প্রক্রিজাত করা হয়।

চিত্র ৮: কালো ইলমেনাইট বালু

ইলমেনাইটের রাসায়নিক গঠন

ইলমেনাইটের আদর্শ রাসায়নিক গঠন $FeTiO3$। তবে এটি প্রায়শই পরিবর্তনশীল পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম বা ম্যাঙ্গানিজ সমন্বিত করে রাসায়নিক গঠন রচনা করতে পারে।

ইলমেনাইটের শারীরিক বৈশিষ্ট্য

ইলমেনাইট হলো একটি ধাতব বা আধা ধাতবীয় দিপ্তিসহ কালো খনিজ। কেবল এক নজরে এটি সহজেই হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইটের সাথে বিভ্রান্ত হতে পারে। পার্থক্য কেবল, হেমাটাইটের একটি লাল রেখা থাকে এবং ইলমেনাইটের একটি কালো রেখা থাকে। ম্যাগনেটাইট

দৃঢ়ভাবে চৌম্বকীয় আর ইলম্যানাইট চৌম্বকীয় নয়। কখনও কখনও ইলমেনাইট দুর্বলভাবে চৌম্বকীয় হয় সম্ভবত স্বল্প পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত ম্যাগনেটাইট থেকে বলে। ইলমেনাইট সাধারণত আগ্নেয় শিলার অন্যান্য খনিজগুলির চেয়ে বেশি টেকসই হয়। যে কারণে, এই শিলাগুলির ধ্বংসাবশেষ ইলমনাইট সমৃদ্ধ। এর তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাধ্যাকর্ষণ এটিকে সোনা, রত্ন এবং অন্যান্য ভারী খনিজগুলির মতো প্লেসার ডিপোজিটে জমা করে।

ইলমেনাইট ব্যবহার

ইলমেনাইট হলো টাইটানিয়াম ধাতুর প্রাথমিক আকরিক। স্বল্প পরিমাণে টাইটানিয়াম নির্দিষ্ট কছিু ধাতবের সাথে মিলিত হয়ে টেকসই, উচ্চ-শক্তির, হালকা সংকর ধাতু উৎপাদন করে। এই সংকর ধাতুগুলি বিভিন্ন ধরণের উচ্চক্ষমতার যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: বিমানের অংশ, মানুষের জন্য কৃত্রিম জয়েন্ট এবং সাইকেলের ফ্রেম, ক্রীড়া সরঞ্জাম ইত্যাদি। অবশিষ্ট ইলমেনাইটের বেশিরভাগটি টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড ($TiO2$) তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, এটি একটি সাদা, অত্যন্ত প্রতিফলক উপাদান। টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো হোয়াইটনিং হিসাবে। হোয়াইটনিং হলো সাদা, অত্যন্ত প্রতিফলক উপকরণ যা গুঁড়ো আকারে এবং রঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই রঞ্জকগুলি পেইন্ট, কাগজ, আঠা, প্লাস্টিক, টুথপেস্ট এবং এমনকি খাবারে একটি সাদা রঙ এবং উজ্জ্বলতা তৈরি করে।

ম্যাগনেটাইট

ম্যাগনেটাইট একটি সহজলভ্য আয়রন অক্সাইড ($Fe3O4$) খনিজ যা আগ্নেয়, রূপান্তরিত এবং পাললিক শিলাগুলিতে পাওয়া যায়। এটি খনি হতে আহরি সর্বাধিক আয়রনের আকরিক যার মধ্যে সর্বাধিক লোহা (72.4%) বিদ্যমান।

চিত্র ৯: ম্যাগনেটাইট

ম্যাগনেটাইট সনাক্তকরণ

ম্যাগনেটাইট সনাক্ত করা খুব সহজ। এটি গুটিকয়েক খনিজগুলির মধ্যে একটি যা একটি সাধারণ চৌম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি একটি কালো, অস্বচ্ছ, আধাধাতব থেকে ধাতব খনিজ যার মোহস কঠোরতা (Mohs Hardness) 5 এবং 6.5 এর মধ্যে রয়েছে। এটি প্রায়শই আইসোমেট্রিক স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। এটি প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া শক্তিশালী চৌম্বকীয় খনিজ।

চিত্র ১০: ম্যাগনেটাইট স্ফটিক

লোডস্টোন" হিসাবে ম্যাগনেটাইট

সাধারণ ম্যাগনেটাইট চৌম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে কয়েকটি নমুনা নিজেই চৌম্বকীয় ধর্ম প্রদর্শন করেন এবং ছোট লোহার টুকরা, ছোট ম্যাগনেটাইট টুকরা ও অন্য চৌম্বকীয় বস্তুকে আকর্শন করার ক্ষমতা রাখে। ম্যাগনেটাইটের এই চৌম্বকীয় রূপটি, "লোডস্টোন" হিসাবে পরিচিত। লোডস্টোন সহজেই চিহ্নিত করা যায় কারণ এটি সাধারণত ছোট ছোট ম্যাগনেটাইট কণা এবং অন্যান্য চৌম্বকীয় খনিজগুলির ছোট কণা দিয়ে আবৃত থাকে।

চিত্র ১১: ম্যাগনেটাইট (লোডস্টোন)

লোহার আকরিক হিসাবে ম্যাগনেটাইটের ব্যবহার

খননকৃত লোহার আকরিকের অধিকাংশই ব্যান্ডেড পলল শিলা যা ট্যাকোনাইট নামে পরিচিত যা ম্যাগনেটাইট, হেমাটাইট এবং চার্ট এর মিশ্রণে গঠিত। একসময়ে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে বিবেচিত ট্যাকোনাইট, উচ্চ গ্রেডের ডিপোজিট প্রাপ্তি হ্রাস হওয়ার পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকরিক হয়ে ওঠে। আজকের বাণিজ্যিক ট্যাকোনাইটগুলিতে ওজন অনুসারে 25 থেকে 30% আয়রন রয়েছে।

ভারী মিডিয়া হিসাবে ম্যাগনেটাইটের ব্যবহার

গুঁড়া ম্যাগনেটাইট প্রায়শই একটি ঘন, উচ্চ ঘনত্বের মিশ্রন তৈরি করতে তরলের সাথে মিশ্রিত করা হয় যা নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগনেটাইট এর অন্যান্য ব্যবহার

ইলেক্ট্রোফটোগ্রাফিতে স্বল্প পরিমাণে ম্যাগনেটাইট টোনার হিসাবে, রাসায়নিক সারগুলিতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট হিসাবে, পেইন্টগুলিতে রঙ্গক হিসাবে এবং উচ্চ ঘনত্বের কংক্রিটের সামগ্রিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চৌম্বক এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

ম্যাগনেটাইটের ক্ষুদ্র স্ফটিকগুলি অনেক শিলায় উপস্থিত রয়েছে। আগ্নেয় শিলাটির স্ফটিককরণের সময়, গলিত ম্যাগনেটাইটের ক্ষুদ্র স্ফটিকগুলি চৌম্বকীয় হওয়ায় তারা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে নিজেকে সজ্জিত করে। এটি শিলার মধ্যে স্ফটিক সৃষ্টির মুহূর্তে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখকে সংরক্ষণ করে।

আজ, ভূতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন বয়সের শিলাগুলির চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করতে পারেন এবং পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র পরিবর্তনের ইতিহাসটিকে পুনর্গঠন করতে পারেন। এই তথ্য একাধিক মহাদেশে একাধিক অবস্থানের জন্য উপলব্ধ। এটি সময়ের সাথে মহাদেশগুলির গতিবিধি সম্পর্কে জানতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

জিরকন

জিরকন 2000 বছরেরও বেশি সময় ধরে রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত। এটি জিরকোনিয়ামের প্রাথমিক আকরিক।

চিত্র ১২: জিরকন

জিরকন একটি জিরকনিয়াম সিলিকেট খনিজ, এর রাসায়নিক সংকেত $ZrSiO4$। আগ্নেয়, রুপান্তরিত এবং পাললিক শিলাগুলির একটি ক্ষুদ্র উপাদান। জিরকন একটি জনপ্রিয় রত্নপাথর যা প্রায় 2000 বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জিরকন বিভিন্ন রঙে দেখা যায় এবং এর উজ্জ্বলতা ও আলোক ছটা একে হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলে। বর্ণহীন জিরকন কখনও কখনও স্বল্প ব্যয়ে হীরার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জিরকন বেশিরভাগ মাটি এবং পাথরখন্ডযুক্ত পাললিক শিলায় উপস্থিত রয়েছে। জিরকন সমৃদ্ধ পললগুলি খনন করা হয় এবং উদ্ধার হওয়া জিরকন জিরকোনিয়াম ধাতু এবং জিরকোনিয়াম ডাই অক্সাইড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদনে এবং শিল্প প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ভূতাত্ত্বিক ঘটনা

জিরকন বেশিরভাগ গ্রানাইটিক শিলাগুলির একটি প্রাথমিক আনুষঙ্গিক খনিজ। এটি নিস (Gneiss) এবং জিরকোন সমৃদ্ধ আগ্নেয় শিলাগুলির রূপান্তর থেকে উদ্ভূত অন্যান্য শিলাগুলিতেও উপস্থিত রয়েছে। জিরকন এতই সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের শিলাগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে যে এটিকে একটি সর্বব্যাপী খনিজ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে জিরকন সাধারণত খুব ছোট কণার আকারের কারণে পাথর এবং পলিগুলিতে সহজে চিহ্নিত করা যায় না। আকারে কয়েক মিলিমিটারের বেশি আকারের জিরকনের কণা বিরল - এগুলি সাধারণত আকারে এক মিলিমিটারের নীচে থাকে। এটি পৃথিবীর অন্যতম সাধারণ তবে সর্বাধিক অবহেলিত খনিজ।

জিরকন রাসায়নিক পরিবর্তন এবং ক্ষয়রোধী। যখন জিরকনযুক্ত শিলাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তার পলিগুলি ক্ষয়ে যায় তখন প্রচুর পরিমানে জিরকন কণাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। এই জিরকন কণাগুলি মাটি, পলি বা পাললিক শিলাতে কোটি বছর পর্যন্তও অবস্থান করতে এগুলি উত্থান, ক্ষয় এবং বিস্তারের বিভিন্ন চক্র থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

রত্ন পাথর হিসাবে জিরকন

জিরকন 2000 বছরেরও বেশি সময় ধরে রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটির খুব উচ্চ বিচ্ছুরন ও অপসারণের ক্ষমতা এটিকে উজ্জ্বলতা এবং আলোক ছটা দেয় যা একে হীরার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলে। যে কারণে বর্ণহীন জিরকন জনপ্রিয় এবং প্রতারণামূলক উভয়ভাবে হীরার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। জিরকন একটি জনপ্রিয় রত্ন কারণ এটি বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ প্রাকৃতিক জিরকনগুলি হলুদ, লাল বা বাদামী রঙের হয়। উত্তাপ এবং ইরাডিয়েশন পদ্ধতিতে বর্ণহীন, নীল, সবুজ এবং অন্যান্য অনেকগুলি রঙে জিরকন উৎপাদন করা যেতে পারে। নীল জিরকন সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিক্রি হওয়া প্রায় 80% জিরকনই নীল।

চিত্র ১৩: জিরকন রত্নপাথর

জিরকন এর শিল্প ব্যবহার

জিরকন বালির বিস্তৃতি গুনাঙ্ক কম এবং উচ্চ তাপমাত্রায় খুব স্থিতিশীল। এটি অনেক শিল্প কারখানায় ঢালাই উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি হ'ল সিরামিক তৈরিতে। জিরকনিয়াম ডাই অক্সাইড (জিরকোনিয়া) জিরকন বালিকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে জিরকন কণা ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। গুঁড়া আকারে জিরকোনিয়াম ডাই অক্সাইড উজ্জ্বল সাদা, উত্তম প্রতিফলক এবং তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল। সিরামিকস এবং মৃৎশিল্পগুলিতে ব্যবহৃত গ্লাজ এবং দাগগুলিতে এটি একটি অপসিফায়ার, সাদা রঙ এবং রঙ্গাক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও স্থিতিশীল জিরকোনিয়া ফাইবার অপটিক উপাদান, প্রলেপ, সিরামিক, অন্যান্য দাঁতের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। জিরকন জিরকনিয়াম ধাতবটির প্রাথমিক আকরিক হিসাবে কাজ করে। জিরকনিয়াম বিভিন্ন ধাতব পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার উত্তাপ এবং ক্ষয় প্রতিরোধের প্রয়োজন। এটি উচ্চক্ষমতার সংকর, বিশেষ ধরনের ইস্পাত, ল্যাম্প ফিলামেন্টস, বিস্ফোরক প্রাইমার, কম্পিউটার সরঞ্জাম এবং অনেকগুলি ইলেকট্রনিক্স উপাদান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

জিরকন এবং তেজস্ক্রিয় ক্ষয়

অনেক জিরকন স্ফটিকগুলিতে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের উপস্থিতি রয়েছে। এই তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলি স্ফটিককরণের সময় জিরকোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তারা স্থায়ী হারে তাদের ক্ষয়কারী বস্তুতে রূপান্তর করে। দ্রব্যজাত বস্তুর সাথে মাতৃ উপাদানের অনুপাত স্ফটিককরণের সময়টি অনুমান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, বিশ্বের প্রাচীনতম খনিজ জিরকন স্ফটিক অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া গেছে । তাদের বয়স প্রায় ৪.৪ বিলিয়ন বছর বলে মনে করা হচ্ছে।

রুটাইল

টাইটানিয়ামের উৎস, একটি সাদা রঞ্জক, "চোখ" এবং "তারা" সম্বলিত মূল্যবান রত্ন সৃষ্টির একটি কারণ।

চিত্র ১৪: রুটাইল

রুটাইল একটি টাইটানিয়াম অক্সাইড খনিজ যার রাসায়নিক সংকেত $TiO2$। এটি বিশ্বজুড়ে আগ্নেয়, রুপান্তরিত এবং পাললিক শিলাগুলিতে পাওয়া যায়। রুটাইল অন্যান্য খনিজগুলিতে সুই-আকারের স্ফটিক হিসাবেও অবস্থান করে। রুটাইলের উচ্চ মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রায়শই এটি ভারী খনিজ বালুতে পানির প্রবাহ এবং তরঙ্গ ক্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত হয়ে উপকূল এবং স্থল উভয় স্থানে জমা হয়। বিশ্বের বেশিরভাগ রুটাইল এই বালুকণা থেকেই উৎপাদিত হয়। রুটাইল টাইটানিয়ামের আকরিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এর সাদা গুঁড়ো পেইন্টগুলিতে রঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি নানাবিধ পণ্যে ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সূঁচের আকারের রুটাইল স্ফটিকের নেটওয়ার্কগুলি স্টার রুবি এবং স্টার সেফিয়ার মতো অনেক রত্নগুলিতে "চোখ" এবং "তারা" তৈরি করে।

ভূতাত্ত্বিক ঘটনা

রুটাইল গ্রানাইটের মতো প্লুটোনিক আগ্নেয় শিলা এবং পেরিডোটাইট ও ল্যাম্প্রোয়েটের মতো গভীর উৎসের আগ্নেয় শিলাগুলিতে একটি আনুষঙ্গিক খনিজ হিসাবে দেখা যায়। রূপান্তরিত শিলা যেমন নিস, সিস্ট এবং ইক্লোসাইটের একটি সাধারণ আনুষঙ্গিক খনিজ হলো রুটাইল। রুটিলের সুগঠিত স্ফটিকগুলি কখনও কখনও পেগমেটাইট এবং স্কার্ন এ পাওয়া যায়। রুটাইল এবং অন্যান্য ধাতব আকরিক খনিজগুলি একসাথে "ভারী খনিজ বালু" হিসাবে পরিচিত পলি থেকে খনন করা হয়। এই পললগুলি আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শৈলগুলির ক্ষয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে যাতে উচ্চ মাধ্যাকর্ষন শক্তি সম্পন্ন খনিজ যেমন রুটিল, ইলমেনাইট, আনাটেস, ব্রুকাইট, লিউকোক্সেন, পেরোভস্কাইট এবং টাইটানাইট এর প্রচুর ক্ষুদ্র দানা থাকে।

এই শিলাগুলি ক্ষয়ের সাথে সাথে, তাদের ক্ষয়রোধী খনিজ কণাগুলি সামুদ্রিক উপকূলীয় পরিবেশে ধুয়ে যায় এবং তরঙ্গ বাহিত হয়ে তাদের ঘনত্ব অনুসারে জমা হতে থাকে।

রত্নপাথর হিসেবে রুটাইল

রুটাইল অন্যান্য খনিজগুলির মধ্যে প্রিজম-আকৃতির স্ফটিক হিসাবে সৃষ্টির জন্য একটি প্রবনতা রয়েছে। রুটাইলের লম্বাকৃতির দীর্ঘ প্রিজমগুলি বিভিন্ন রত্ন খনিজগুলিতে থাকে। যেমন কোয়ার্টজ, কোরান্ডাম (রুবি এবং নীলকান্তমণি), গারনেট এবং অ্যান্ডালুসাইট ইত্যাদি। কখনও কখনও এই সূঁচাকৃতির মোটা রুটাইলগুলি মণির মধ্যে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়। এই সূঁচগুলি রত্নকে আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় করে যখন তারা মনোরম রঙে এবং সজ্জিত অবস্থায় থাকে। রুবি এবং নীলকান্তের মতো কিছু রত্নগুলিতে, সঠিকভাবে কাটা সূক্ষ্ম রুটাইলের স্ফটিক থেকে আলোর প্রতিচ্ছবি রত্নটির পৃষ্ঠের উপরে একটি সুন্দর "তারাকৃতি" তৈরি করে। এই তারাটির সাথে রত্ন রুবি এবং নীলকান্তমণি বাণিজ্যিকভাবে "অভূতপূর্ব রত্ন" নামে পরিচিত। অন্যান্য রত্নগুলিতে, সমান্তরাল স্ফটিকগুলির একটি দিক রত্নের পৃষ্ঠে আলোর রেখা তৈরি করবে যা "ক্যাটস আই" নামে পরিচিত।

রুটাইল এর ব্যবহার

রুটাইল এবং রুটাইল থেকে তৈরি টাইটানিয়াম অক্সাইডের প্রাথমিক ব্যবহারগুলি হ'ল: টাইটানিয়াম অক্সাইড রঙ্গাক উৎপাদন, গলন প্রতিরোধী সিরামিকস এবং টাইটানিয়াম ধাতুর উৎপাদন। টাইটানিয়াম অক্সাইড পিগমেন্টগুলি প্লাস্টিকে সাদা রঙ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি উজ্জল সাদা কাগজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। টাইটানিয়াম অক্সাইড এই পণ্যগুলিকে এমন একটি রঙ দেয় যা বিবর্ণ হয় না। টাইটানিয়াম অক্সাইড ননটক্সিক এবং রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে খাদ্য, প্রসাধনী, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং টুথপেস্টের মতো অনেক ভোক্তা পণ্যগুলিতে রঙ্গাক হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

গারনেট

একটি লাল রত্ন এবং জানুয়ারীর জন্মস্টোন হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। গারনেট বিভিন্ন রঙে ঘটে এবং এর অনেকগুলি শিল্প ব্যবহার রয়েছে।

চিত্র ১৫: গারনেট

গারনেট হল শিলা গঠনের খনিজগুলির একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত নাম। এই খনিজগুলি একটি সাধারণ স্ফটিক কাঠামো এবং X3Y2(SiO4)3 এর একটি সাধারণ রাসায়নিত গঠন ধারন করে । এই সংমিশ্রণে, " X " Ca, Mg, Fe2+ বা Mn2+ হতে পারে এবং "Y" Al, Fe3+, Mn3+, V3+ বা Cr3+ হতে পারে। এই খনিজগুলি বিশ্বজুড়ে আগ্নেয়, রুপান্তরিত এবং পাললিক শিলাগুলিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গারনেট পৃথিবীর উপরিভাগের কাছাকাছি গঠিত হয় যখন শেলের মতো উচ্চ অ্যালুমিনিয়ামযুক্ত পাললিক শিলা তাপ এবং চাপের প্রভাবে সিস্ট বা নিস উৎপন্ন করার করে। গারনেট contact metamorphism, ভূপৃষ্ঠের নিচের ম্যাগমা চেম্বার, লাভা প্রবাহ, গভীর উৎসে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং গারনেট বহনকারী শৈলগুলি ক্ষয় করার সময় গঠিত মাটি এবং পলির মধ্যেও পাওয়া যায়। বেশিরভাগ লোক "গারনেট" শব্দটি একটি লাল রত্নপাথরের সাথে সংযুক্ত করে; যাইহোক, তারা প্রায়শই জানতে পেরে অবাক হন যে গারনেট অন্যান্য অনেক রঙে ঘটে এবং এর আরও অনেকগুলি ব্যবহার রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গারনেটের প্রধান শিল্প ব্যবহারগুলি ছিল ওয়াটারজেট কাটিং (35%), ব্লাস্টিং মিডিয়া (30%), জল পরিস্রাবণের গ্রানুলস (20%), এবং ক্ষয়কারী পাউডার (10%)।

গারনেট শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

গারনেট গ্রুপের সর্বাধিক প্রাপ্ত খনিজগুলির মধ্যে অ্যালামন্ডাইন, পাইরোপ, স্পেসারটাইন, অ্যান্ড্রাডাইট, গ্রসুলার এবং ইউভারোভাইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলির সমস্তটির মধ্যে একটি কাঁচসদৃশ দীপ্তি, স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছভাব, ভঙ্গুরতা এবং খাঁজবিহীন বৈশিষ্ট বিদ্যমান। এগুলি স্বতন্ত্র স্ফটিক, জলপ্রবাহে জমা নুড়ি, দানাদার সমষ্টি এবং সমন্বিত গঠন হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। তাদের রাসায়নিক গঠন, মাধ্যাকর্ষণ, কঠোরতা এবং রং নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-

টেবিল ১৮: গারনেট খনিজ

খনিজ	রাসায়নিক গঠন	মাধ্যাকর্ষণ	কঠোরতা	রং
Almandine	$Fe_3Al_2(SiO_4)_3$	৪.২০	৭-৭.৫	লাল, বাদামী
Pyrope	$Mg_3Al_2(SiO_4)_3$	৩.৫৬	৭-৭.৫	লাল-রক্তবর্ণ
Spessartine	$Mn_3Al_2(SiO_4)_3$	৪.১৮	৬.৫-৭.৫	কমলা-লাল-বাদামী
Andradite	$Ca_3Fe_2(SiO_4)_3$	৩.৯০	৬.৫-৭	সবুজ, হলুদ, কালো
Grossular	$Ca_3Al_2(SiO_4)_3$	৩.৫৭	৬.৫-৭.৫	সবুজ, হলুদ, লাল, গোলাপী, স্বচ্ছ
Uvarovite	$Ca_3Cr_2(SiO_4)_3$	৩.৮৫	৬.৫-৭	সবুজ

উপরে যেমনটি দেখা গেছে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের গারনেট রয়েছে এবং প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা রাসায়নিক সংমিশ্রণ রয়েছে। বেশিরভাগ গারনেট খনিজগুলির মধ্যে কঠিন সমাধান সিরিজও রয়েছে রসায়নের এই বিস্তৃত প্রকরণটি তাদের অনেকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যালসিয়াম গারনেটের সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ থাকে, কম শক্ত থাকে এবং সাধারণত সবুজ বর্ণের হয়। বিপরীতে, লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজ গারনেটের উচ্চতর নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, একটি বৃহত্তর কঠোরতা এবং সাধারণত লাল রঙের হয়।

কিভাবে গারনেট গঠিত হয়

রূপান্তরিত শিলাগুলিতে গারনেট

বেশিরভাগ গারনেট কনভারজেন্ট প্লেট বাউন্ডারিগুলোতে শেলে রিজিওনাল মেটামরফিজম দ্বারা ঘঠিত হয়। মেটামরফিজমের তাপ এবং চাপ রাসায়নিক বন্ধনগুলি ভেঙে দেয় এবং খনিজগুলিকে নতুন তাপমাত্রা-চাপের পরিবেশের অধীনে স্থিতিশীল কাঠামোর স্ফটিক গঠন করতে দেয়। অ্যালুমিনিয়াম গারনেট, অ্যালামন্ডাইন সাধারণত এই পরিবেশে তৈরি হয়। এই শিলাগুলির রূপান্তরকালীন সময়ে গারনেটগুলি ক্ষুদ্র দানা হিসাবে গঠিত হয় এবং রুপান্তর প্রকৃয়াির সাথে সাথে বড় হতে থাকে। বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা আশেপাশের শিলা সামগ্রীগুলি স্থানচ্যুতি, প্রতিস্থাপন এবং অন্তর্ভুক্ত করে।

আগ্নেয় শিলাগুলিতে গারনেট

গারনেট প্রায়শই গ্রানাইটের মতো আগ্নেয় শিলাগুলিতে একটি আনুষঙ্গিক খনিজ হিসাবে দেখা যায়। অনেকে অ্যালামন্ডাইন গারনেটের সাথে পরিচিত কারণ এটি কখনও কখনও আগ্নেয় শিলাগুলিতে লাল স্ফটিক হিসাবে দেখা যায়। স্পেসার্টাইন একটি কমলা গারনেট যা গ্রানাইট পেগমেটাইটে স্ফটিক হিসাবে পাওয়া যায়। পাইরোপ হ'ল একটি লাল গারনেট যা গভীর উৎসের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ম্যান্টেল থেকে ছিঁড়ে যাওয়া পেরিডোটাইটের টুকরোতে ভূপৃষ্ঠে আসে। গারনেট বেসালটিক লাভা প্রবাহেও পাওয়া যায়।

পাললিক শিলা এবং পলিগুলিতে গারনেট

গারনেটগুলি তুলনামূলকভাবে টেকসই খনিজ। এগুলি প্রায়শই মৃত্তিকা এবং পলিতে ঘনীভূত অবস্থায় দেখা যায় যা গারনেট বহনকারী শিলাগুলি ক্ষয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়।। এই পললযুক্ত গারেটগুলি প্রায়শই খনির কার্যক্রমের টার্গেট হয় কারণ এগুলি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পলি/মাটি থেকে খনন করা সহজ এবং আলাদা করা সহজ।

গারনেটের ব্যবহার

গারনেট হাজার বছর ধরে রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গত দেড়শ বছরে এটির শিল্প খনিজ হিসাবে অনেকগুলি অতিরিক্ত ব্যবহারও দেখা গেছে।

শিল্প খনিজ হিসাবে গারনেট

গারনেট অ্যাব্রেসিভস

গারনেটের প্রথম শিল্প ব্যবহারটি ছিল একটি ক্ষয়কারী হিসাবে। গারনেট একটি তুলনামূলকভাবে শক্ত খনিজ (মোহস স্কেলে 6.5 থেকে 7.5 এর মধ্যে থাকে)। যা এটিকে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনকার্যে কার্যকর ক্ষয়কারী হিসাবে ব্যবহার করতে দেয়। পিষ্ট করা হলে এটি কৌণিক টুকরো টুকরো হয়ে যায় যা কাটা এবং ক্ষয় করার জন্য ধারালো প্রান্ত তৈরি করে। অভিন্ন আকারের ছোট দানাগুলি একটি লালচে রঙের স্যান্ডপেপার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় যা কাঠের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ওয়াটারজেট কাটিং

যুক্তরাষ্ট্রে গারনেটের বৃহত্তম শিল্প ব্যবহার হ'ল ওয়াটারজেট কাটিং। ওয়াটারজেট কাটার হিসাবে পরিচিত একটি মেশিন একটি উচ্চ-চাপ জলের সাথে গ্রানাইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ঝাপটা উৎপন্ন করে। এগুলি ধাতব, সিরামিক বা পাথরের টুকরোতে আঘাত করলে একটি কাটিং ক্রিয়া ঘটতে পারে যা খুব কম ধুলা তৈরি করে এবং কম তাপমাত্রায় সংঘটিত হয়।

ব্লাস্টিং

গারনেট দানাগুলি ঘর্ষণকারী ব্লাস্টিংয়ে ব্যবহৃত হয় (সাধারণত "বালি ব্লাস্টিং" নামে পরিচিত)।

পরিস্রাবণ

গারনেট গ্রানুলগুলি প্রায়শই একটি ফিল্টার মিডিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট গারনেট কণাগুলি একটি ধারক পূরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে তরল প্রবাহিত হয়। গারনেটের কণামধ্যস্থ স্থানগুলি তরল প্রবাহের জন্য যথেষ্ট ছোট তবে কিছু দূষিত কণা প্রবাহের জন্য খুবই ছোট, যা প্রবাহ থেকে ফিল্টার করা হয়। গারনেট এই ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কারণ এটি তুলনামূলকভাবে জড় এবং উচ্চ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন। গারনেট পিষ্ট করে প্রায় 0.3 মিলিমিটার আকারে গ্রেড করে, কয়েক মাইক্রোন ব্যাসের মতো ছোট দূষিত কণাকে ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভূতাত্ত্বিক সূচক খনিজ হিসাবে গারনেট

যদিও পৃথিবী পৃষ্ঠে পাওয়া, বেশিরভাগ গারনেট ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়েছে, গভীর উৎসে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময় গারনেট ম্যান্টেল থেকে উঠে আসে। এই অগ্নুৎপাতে "জেনোলিথস" নামে পরিচিত ম্যান্টলের টুকরো থাকে এবং এগুলিকে "পাইপ" হিসাবে পরিচিত কাঠামোয় পৃষ্ঠের দিকে ঠেলে দেয়। এই জেনোলিথগুলি পৃথিবীর পৃষ্ঠে বা তার কাছাকাছি পাওয়া বেশিরভাগ হীরার উৎস। যদিও জেনোলিথগুলিতে হীরা থাকে তবে এগুলি প্রায়শই প্রতিটি হীরার জন্য প্রচুর পরিমাণে গারনেট থাকে এবং এই গারনেটগুলি সাধারণত আকারে বড় হয়। এই গভীর উৎসের গারনেট অগভীর ভূত্বকে গঠিত গারনেট থেকে পৃথক হয়। সুতরাং, হীরার অনুসন্ধানের একটি ভাল উপায় হ'ল এই অনন্য গারনেট সন্ধান করা। গারনেট ভূতাত্ত্বিকদের জন্য হীরা অনুসন্ধানের "সূচক খনিজ" হিসাবে কাজ করে।

রত্ন পাথর হিসাবে গারনেট

গারনেট 5000 বছরেরও বেশি সময় ধরে রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অনেক মিশরীয় সমাধির গহনাতে পাওয়া গেছে এবং প্রাচীন রোমের সর্বাধিক জনপ্রিয় রত্নপাথর ছিল। এটি একটি সুন্দর রত্ন যা সাধারণত কোনও ধরনের প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই বিক্রি হয়। এটি টেকসই এবং যথেষ্ট সাধারণ যে এটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে গহনাগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। গারনেট আজও একটি জনপ্রিয় রত্নপাথর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। "গারনেট" নামটি শুনলে বেশিরভাগ লোক একটি লাল রত্নপাথরের কথা ভাবেন কারণ তারা জানেন না যে গারনেট বিভিন্ন রঙে ঘটে। যাইহোক, মণি-মানের গারেটস প্রতিটি রঙে ঘটে - লাল হ'ল সবচেয়ে সাধারণ এবং নীল গারনেটগুলি বিশেষত বিরল।

চিত্র ১৬: গারনেট রত্নপাথর

কায়ানাইট

একটি খনিজ সাধারনত চীনামাটির বাসন তৈরিতে, একটি ক্ষয়কারী হিসাবে এবং মাঝে মাঝে রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১৭: কায়ানাইট

কায়ানাইট একটি খনিজ যা মূলত রূপান্তরিত শিলাগুলিতে পাওয়া যায়। এটি বেশিরভাগ সময় পলির শিলাগুলির রূপান্তরকালে কাদামাটির খনিজগুলির উচ্চ-চাপ পরিবর্তন থেকে তৈরি হয়। এটি আঞ্চলিক রূপান্তরিত অঞ্চলগুলির সিস্ট এবং নিসে পাওয়া যায় এবং কোয়ার্টজাইট বা ইক্লোজাইটে কম দেখা যায়। কায়ানাইটের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট সজ্জিত স্ফটিক, যদিও এটি কখনও কখনও স্ফটিকের বিস্তৃত গুচ্ছ হিসাবে দেখা যায়। কায়ানাইট প্রায়শই অন্যান্য রূপান্তরিত খনিজগুলির সাথে যুক্ত থাকে যেমন গারনেট, স্টায়ারোলাইট এবং কোরান্ডাম।

ক্যানাইটের অস্বাভাবিক কঠোরতা

ক্যানাইট নমুনাগুলিতে একটি পরিবর্তনশীল কঠোরতা রয়েছে। স্ফটিকের দৈর্ঘ্যের সমান্তরালভাবে পরীক্ষিত হলে দীর্ঘ স্ফটিকগুলির মোহস কঠোরতা ৪.৫ থেকে ৫ এবং একটি স্ফটিকের প্রস্থের সমান্তরালভাবে পরীক্ষিত হলে 6.5 থেকে 7 কঠোরতা থাকে। খনিজটিকে একসময়ে "Disthene" বলা হত যার অর্থ "দুটি শক্তি"।

$Al2SiO5$ এর পলিমার্ফস

তিনটি খনিজ পদার্থের রাসায়নিক গঠন $Al2SiO5$ । এগুলি হলো কায়ানাইট, অ্যান্ডালুসাইট এবং সিলিমেনাইট। কায়ানাইট হ'ল উচ্চ-চাপ পলিমার্ফ, উচ্চ তাপমাত্রায় সিলিমানাইট গঠিত হয় এবং অ্যান্ডালুসাইট হ'ল নিম্নচাপযুক্ত পলিমার্ফ।

কায়ানাইটের শিল্প ব্যবহার

কায়ানাইট বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-তাপমাত্রার চুল্লিগুলিতে ব্যবহৃত ইট, মর্টার এবং ভাটার সামগ্রী উৎপাদন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। উচ্চ-তাপমাত্রা ধাতু ঝালাইয়ের জন্য যে ছাঁচগুলি ব্যবহৃত হয় তা প্রায়শই কায়ানাইট দিয়ে তৈরি করা হয়।

চীনামাটির বাসন তৈরিতে ব্যবহার

কায়ানাইটের বৈশিষ্ট্য এটিকে উচ্চ শক্তির চীনামাটির বাসন তৈরির জন্য খুব ভালভাবে উপযুক্ত করে তোলে - এমন একটি চীনামাটির বাসন যা খুব উচ্চ তাপমাত্রায় তার শক্তি ধারণ করে। এই জাতীয় চীনামাটির একটি পরিচিত ব্যবহার হল স্পার্ক প্লাগের সাদা অন্তরক হিসাবে।

কায়ানাইটের আরও কিছু সাধারণ ব্যবহার হল দাঁতের ডেন্টিং, রান্নাঘরের সিঙ্ক এবং বাথরুমের সরঞ্জাম তৈরিতে।

ক্ষয়কারী পণ্যগুলিতে ব্যবহার

কায়ানাইটের তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কঠোরতা একে চূর্ণকারী চাকা এবং কর্তন চাকা উৎপাদনে একটি দুর্দান্ত উপাদান হিসাবে তৈরি করে। এটি প্রাথমিক ক্ষয়কারী হিসাবে ব্যবহৃত হয় না; পরিবর্তে, এটি সংযোজনকারী অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা ঘষক কণাকে এক চাকার আকারে একসাথে ধারণ করে।

উত্তপ্ত হলে কায়ানাইটের সম্প্রসারণ

কায়ানাইট উত্তপ্ত হলে তা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হতে পারে। কণার আকার, তাপমাত্রা এবং উত্তাপের অবস্থার উপর নির্ভর করে উত্তাপিত হলে কায়ানাইট তার মূল পরিমাণের দ্বিগুণ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এই সম্প্রসারণ অনুমানযোগ্য। নির্দিষ্ট পণ্য তৈরিতে, সমাপ্ত পণ্যটিতে ভলিউম বজায় রাখার জন্য কাঁচামালের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে কায়ানাইট যুক্ত হয়।

রত্নপাথর হিসাবে কায়ানাইট ব্যবহার

কায়ানাইট হ'ল একটি রত্ন পাথর যা সাধারণত গয়নারগুলির দোকানে খুব কমই দেখা যায়। কারণ এটি গহনাতে খুব কম ব্যবহৃত হয়।

উচ্চ মানের এবং সুন্দর রঙিন কায়ানাইট আকর্ষণীয় এবং আকাঙ্ক্ষিত ক্যাবচোন এবং মুখযুক্ত পাথর হিসাবে কাটা যেতে পারে। এগুলি প্রায়শই আংটি, কানের দুল, লকেট এবং অন্যান্য গহনাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। কায়ানাইট পুঁতি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। এই পুঁতিগুলি প্রায়শই একটি সমতল আকৃতিতে থাকে কারণ খনিজগুলি সাধারণত পাতলা আকারে হয়।

চিত্র ১৮: কায়ানাইট রত্নপাথর

কায়ানাইট রত্ন পাথর কাটা কষ্টসাধ্য

কায়ানাইট কাটা কষ্টসাধ্য কারণ এটির দুটি পৃথক পৃথক কঠোরতা রয়েছে। কায়ানাইট স্ফটিকগুলি সাধারণত দীর্ঘ, সরু আকারে হয়। এই পাথরগুলি কাটার জন্য দক্ষ কারিগর প্রয়োজন।

নীল কায়ানাইট - সবুজ কায়ানাইট

বেশিরভাগ রত্ন মানের কায়ানাইট নীল রঙের। তবে কায়ানাইট স্বচ্ছ, সবুজ, কালো এবং খুব কমই বেগুনি হতে পারে। কিছু কায়ানাইট রত্নগুলি হ'ল প্লিওক্রোইক (বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন বর্ণ হিসাবে প্রদর্শিত হয়)। নীল কায়ানাইট পাথর স্বচ্ছ এবং গাঢ় নীলের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন রঙে পাওয়া যাবে। সর্বাধিক জনপ্রিয় কায়ানাইট রত্নগুলি গভীর নীলকান্তমনির মত নীল বর্ণের সাথে স্বচ্ছ। স্বল্প তীব্রতার সাথে স্বচ্ছ নীল কায়ানাইট নীল রঙের পোখরাজ বা নীল একুয়ামেরিনের মতো দেখাবে।

মোনাজাইট

একটি বিরল ফসফেট খনিজ তার বিরল ভূ ও থোরিয়াম উপাদানের জন্য প্লেসার ডিপোজিট থেকে আহরন করা হয়।

চিত্র ১৯: মোনাজাইট

মোনাজাইট হ'ল একটি বিরল ফসফেট খনিজ যার রাসায়নিক সংকেত (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4)। এটি সাধারণত ছোট বিচ্ছিন্ন কণা হিসাবে দেখা যায়, গ্রানাইট, পেগমেটাইট, সিস্ট এবং নিসের মতো আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলাগুলির একটি আনুষঙ্গিক খনিজ হিসাবে। এই কণাগুলি ক্ষয়রোধী এবং ধারক শিলা থেকে মাটি এবং পলিতে নিম্ন প্রবাহে ঘন হয়ে জমা হয়। যখন যথেষ্ট পরিমাণে ঘনত্ব থাকে তখন এগুলি তাদের বিরল ভূ এবং থোরিয়াম উপাদানের জন্য আহরন করা হয়।

একটি খনিজ বা খনিজ গ্রুপ

মোনাজাইটের জাতিগত রাসায়নিক সংকেত (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4) প্রকাশ করে যে সেরিয়াম, ল্যান্থানাম, নিউওডাইমিয়াম এবং থোরিয়াম খনিজগুলি কাঠামোতে একে অপরের বিকল্প হতে পারে; এবং, ফসফেটের জন্য সিলিকার প্রতিস্থাপনও ঘটে। মোনাজাইট অন্যান্য খনিজগুলির সাথে বেশ কয়েকটি কঠিন সমাধান সিরিজের অংশ। "মোনাজাইট" হ'ল মনোক্লিনিক ফসফেট এবং আর্সেনেট খনিজগুলির একটি গ্রুপের নাম যা সংকেত এবং স্ফটিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয়। মোনাজাইট গ্রুপের খনিজগুলির একটি তালিকা নীচে সরবরাহ করা হয়েছে।

টেবিল ১৯: মোনাজাইট খনিজ গ্রুপ	
খনিজ	রাসায়নিক সংকেত
Brabantite	$CaTh(PO_4)_2$
Cheralite	$(Ca,Ce,Th)(P,Si)O_4$
Gasparite-(Ce)	$(Ce,La,Nd)AsO_4$
Monazite-(Ce)	$CePO_4$
Monazite-(La)	$LaPO_4$
Monazite-(Nd)	$NdPO_4$
Monazite-(Sm)	$SmPO_4$
Rooseveltite	$BiAsO_4$

মোনাজাইটের শারীরিক বৈশিষ্ট্য

মোনাজাইট হলুদে বাদামি বা সবুজ বাদামী বা লালচে বাদামী বর্ণের মিনারেল এবংরেসিনাস থেকে ভিট্রিয়াস দীপ্তিযুক্ত। এটি স্বচ্ছ এবং বড় দানা বা সুনির্দিষ্ট স্ফটিকগুলিতে খুব কমই দেখা যায়। দানাদার সমাবেশ কখনও কখনও দেখা যায় যেখানে স্থানীয়ভাবে মোনাজাইট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এটি খাঁজ বরাবর বিভাজনের ঘটায়। এর কঠোরতা 5 থেকে 5.5 অবধি। এটির একটি অস্বাভাবিক উচ্চতর মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে যা এর রাসায়নিক গঠন অনুসারে 4.6 থেকে 5.4 অবধি হতে পারে।

মোনাজাইটের ভূতাত্ত্বিক ঘটনা

মোনাজিট যেখানে তৈরি হয় তার পরিবর্তে এটি কোথায় জমে তা আরও বেশি পরিচিত। এটি আগ্নেয় শিলাগুলির স্ফটিককরণের সময় এবং ক্লাস্টিক পলল শিলাগুলির রূপান্তরকালে তৈরি হয়। যখন এই শিলাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মোনাজাইট আরও প্রতিরোধী খনিজগুলির সাথে ক্ষয়িত ধ্বংসাবশেষে জমা হয়।

মোনাজাইটের মুক্ত কণাগুলি এরপরে নিম্নপ্রবাহে যাত্রা শুরু করে। এগুলি জলধারা বা শুষ্ক হাওয়া দ্বারা বাহিত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ এবং প্রবাহিত জলের ধারা মোনাজাইট এবং অন্যান্য ভারী খনিজগুলিকে হালকা খনিজগুলি থেকে পৃথক করতে সহায়তা করে। এগুলি জলধারার অভ্যন্তরীণ বাঁকগুলিতে, পাথরের পিছনে জমা হয়। কিছু সমুদ্রে ধুয়ে যায়, যেখানে তারা ব-দ্বীপ, সৈকত বা অগভীর জলের পললগুলিতে জমা হয়।

লিউকক্সিন

লিউকক্সিন টাইটানিয়াম খনিজগুলির একটি সূক্ষ্ম দানাদার পরিবর্তিত পণ্য। এটি হলুদ থেকে বাদামি বর্ণের হয়।

এটি মূলত রটিইল বা অ্যানাটেজ সমন্বিত। ইলমনাইট, পেরোভস্কাইট বা টাইটানাইটের পরিবর্তনের ফলে এটি কিছু আগ্নেয় শিলা এবং লোহা আকরিক জমার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ২০: বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের অবস্থান চিত্র

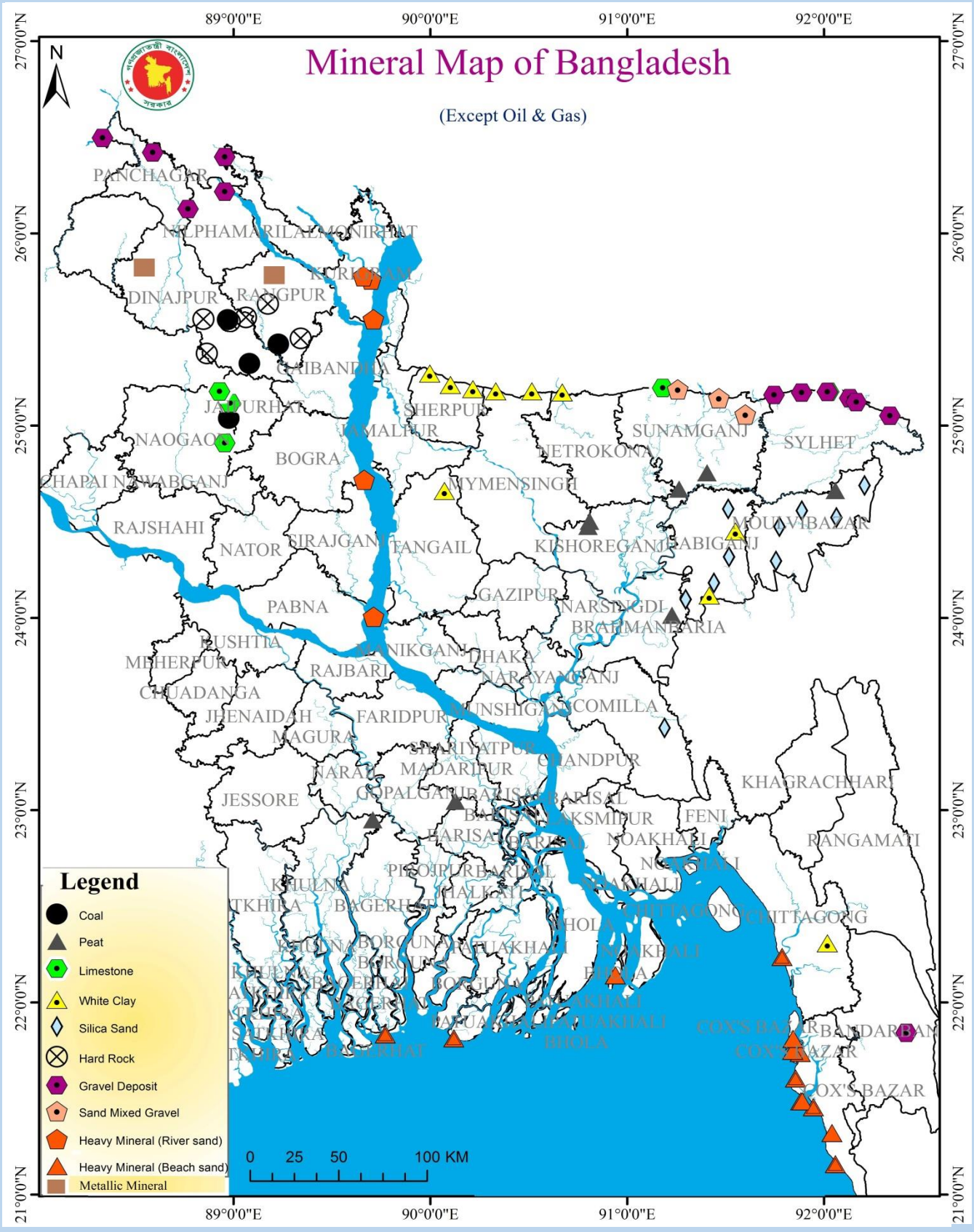

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা বিশ্বে এক অনুকরণীয় রোল মডেল। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.১৫-এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৫.২৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারের সময়ে ৪ টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা আহরণের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সরকার সর্বদা সচেষ্ট। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকার সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কার এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরতে হবে। বর্তমানে দেশে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই সাথে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ, আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত, এসংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং এলপি গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হিসেবে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও হাইড্রোকার্বন ইউনিট দেশের জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।